প্যাথলজী

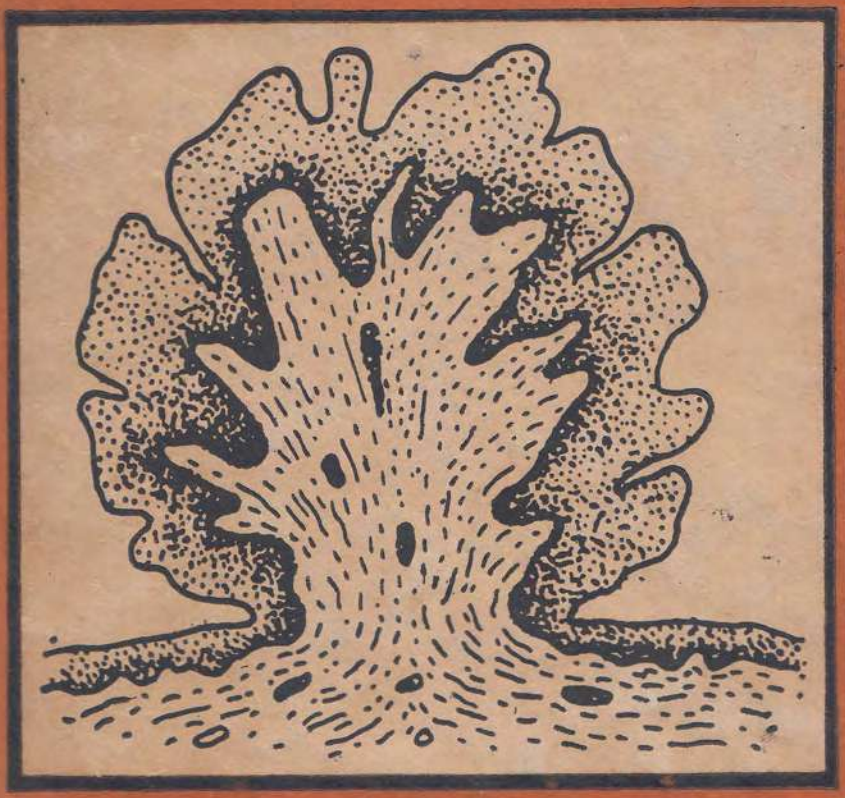

ডাঃ এস.এ.খালেক

প্যাথলজী

ব্যান্সডক গ্রন্থাগার, ঢাকা
বাংলাদেশ
Bansdoc Library, Dhaka

ডাঃ এস. এ. খালেক
এম. বি. বি. এস. (ঢাকা) ডি. পি. এইচ. (পাঞ্জাব)
এম. এস. ইন প্যাথলজী (বেলগ্রেড)
সহযোগী অধ্যাপক, প্যাথলজী বিভাগ,
রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ,
রাজশাহী

ব্যান্সডক গ্রন্থাগার, ঢাকা।
প্রবেশন নং
তারিখ

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯২
জুন, ১৯৮৫

বা.এ. ১৬৬১

পান্ডুলিপি ঃ জীববিজ্ঞান, কৃষি, চিকিৎসা উপবিভাগ,
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মুদ্রণ সংখ্যা ঃ ১২৫০ কপি

প্রকাশক
মোহাম্মদ ইবরাহিম
পরিচালক
পাঠ্য পুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রণে
মোঃ আবুল কালাম
কোয়ালিটা প্রিন্টার্স
২৭/১৬, মনিপুরীপাড়া, সংসদ এভেনিউ
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১৫

প্রচ্ছদ ঃ কালাম আকন্দ

মূল্য ঃ ৪০·০০ (৪ মার্কিন ডলার)

PATHOLOGY (Pathology in Bengali) by Dr. S. A. Khaleque. Published by Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. Ist edition June 1985.
Price Tk. 40·00 (4 U. S. Dollar).

ভূমিকা

প্যাথলজী চিকিৎসাবিদ্যার এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিরাট এর পরিধি। সকল রোগের বিভিন্ন দিক নিয়ে এর কারবার। রোগের হেতুতত্ত্ব, কলার পরিবর্তন, উপসর্গের ব্যাখ্যা, রোগ নির্ণয় ইত্যাদির আলোচনা এর অন্তর্ভুক্ত।

প্যাথলজীর বিভিন্ন বিভাগ আছে। সবচেয়ে যে দুটো প্রধান তারা হলো সাধারণ প্যাথলজী বা জেনারেল প্যাথলজী এবং অঙ্গীয় প্যাথলজী বা সিসটেমিক প্যাথলজী। প্রথমটিতে শ্রেণীভুক্তভাবে বিভিন্ন রোগ যেমন প্রদাহ, টিউমার ডিজেনারেশন, থ্রমবোসিস ইত্যাদি অর্ন্তভুক্ত। অঙ্গীয় প্যাথলজী বিভাগে বিভিন্ন অঙ্গের রোগসমূহ আলোচিত হয়।

প্যাথলজী বইয়ের প্রথম খন্ডের এই বইয়ে সাধারণ প্যাথলজী আলোচিত হয়েছে। স্নাতক পর্যায়ের চিকিৎসাশাস্ত্রের ছাত্রদের যা জানা উচিত তা এই বইয়ে সন্নিবেশিত হয়েছে। বিষয়গুলির আবশ্যকীয় দিকগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে সোজা সরল বাংলায় প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

বিষয়কে সহজবোধ্য করার জন্য ৪৬টি চিত্র দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রণীত প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেখানে শ্রুতিমধুর শব্দ পাওয়া যায়নি সেখানে ইংরেজী শব্দই রাখা হয়েছে। প্রকট টেকনিক্যাল শব্দসমৃদ্ধ এই বিষয়কে যতদূর সম্ভব প্রাঞ্জলভাবে উত্থাপন করা দুরূহ ব্যাপার। কতদূর সফল হয়েছি জানি না।

ছাত্ররা এর থেকে উপকৃত হলে পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করব।

বাংলা একাডেমী এই বই প্রকাশ করার সুযোগ দেওয়ায় তাদের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন তাদের জন্য আমার অঢেল ধন্যবাদ।

এস, এ, খালেক

সূচীপত্র

রুগ্ন-কোষ ... ১

ডিজেনারেশন ১

কোষ-পরিচিতি (নেক্রোসিস) ১২

নেকরোবায়োসিস ১৭

গ্যাংগ্রীন ১৮

পোস্ট মরটেম চেঞ্জ ২০

প্রদাহ ও কোষ পুনর্নির্মাণ ... ২৩

প্রদাহ ২৩

দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ ৩৭

সারকয়েডোসিস ৪৩

কুষ্ঠরোগ ৪৪

সিফিলিস ৪৭

উন্ডের হিলিং ৪৮

কলাবৃদ্ধির গণ্ডগোল ... ৫৪

এট্রফি বা কলাশীর্ণতা ৫৫

কলা বিবর্ধন ৫৮

ডিসপ্লেসিয়া ৬১

এনাপ্লাসিয়া ৬২

টিউমার ... ৬৪

সংযোজনকলার টিউমার ৮৩

সারকোমা ৮৬

ভাসকুলার ডিজঅর্ডার ... ৯২

থ্রমবোসিস ৯২

এমবোলিজম ১০২

ইনফারকশন ১০৬

ইসকেমিয়া ১০৯

রক্তবদ্ধতা ১১০

ডিহাইড্রেশন ১১৩

রক্তপাত ১১৪

পানিবদ্ধতা ১১৬

শক ১২১

প্যাথলজীক্যাল ক্যালসিফিকেশন ও পিগমেন্ট ডিজেনারেশন ... ১২৯

জেনটিক এর গণ্ডগোল ... ১৩৬

১

রুগ্ন-কোষ

ডিজেনারেশন

উত্তেজক পদার্থের প্রভাবে কোষের অভ্যন্তরে যে পরিবর্তন সংঘটিত হয় এবং উত্তেজক অপসারিত হলে কোষ পুনরায় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে তাকে ডিজেনারেশন বা অবক্ষয় বলে। কোষের এই পরিবর্তন রাসায়নিক প্রকৃতির এবং এর ফলে কোষের অবয়বের পরিবর্তন ঘটে। ডিজেনারেশন-জনিত পরিবর্তন শুধুমাত্র কোষের সাইটোপ্লাজমে সংঘটিত হয়; পক্ষান্তরে কেন্দ্রক সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকে।

অবক্ষয়ের মাত্রা ও প্রকৃতি নানাবিধ এবং বিভিন্ন কারণের উপর তা নির্ভরশীল। এদের মধ্যে অন্যতম হলো ঃ

(ক) উত্তেজক পদার্থের মাত্রা ও প্রকৃতি,

(খ) উত্তেজক পদার্থের স্থায়িত্ব।

যে সমস্ত বস্তু উত্তেজক হিসাবে কাজ করে তারা হলো ঃ

(১) ব্যাকটেরিয়া, (২) অপুষ্টি, (৩) ইনফারকশন।

উত্তেজক বস্তু যখন অত্যন্ত শক্তিশালী হয় এবং দীর্ঘকাল ধরে স্থায়ী হয় তখন অবক্ষয়জনিত পরিবর্তন এতদূর গড়ায় যে, তা পুনরায় সুস্থ অবস্থায় ফিরে যেতে ব্যর্থ হয়। ফলে কোষের মৃত্যু ঘটে। একে কোষ-পচিতি বলে।

সংক্ষেপে, অবক্ষয়কে কোষের অসুখ ও কোষ-পচিতিকে কোষের মৃত্যু বলা হয়।

ওতপ্রোতভাবে জড়িত হওয়ার ফলে কোষের সাইটোপ্লাজমে যে সমস্ত বস্তু স্বাভাবিক অবস্থায় অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় না অবক্ষয়ের ফলে তারা চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠে। দু'ভাবে এটা সম্ভবপর হয় ঃ

(ক) যতটুকু বিপাকিত হতে পারে তার চেয়ে বেশী মাত্রায় বস্তু বাইরে থেকে কোষে পৌঁছায়।

(খ) কোষের অভ্যন্তরে ইতিমধ্যে যে সমস্ত বস্তু অদৃশ্যভাবে বিদ্যমান ছিল

কোষের বিপাকীয় কার্যক্ষমতা ব্যাহত হওয়ার ফলে তারা দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠে।

শ্রেণীবিভাগ

অবক্ষয়কে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ

(১) ক্লাউডি সোয়েলিং বা এলবুমিনাস অবক্ষয়,
(২) ভ্যাকুউলার ডিজেনারেশন,
(৩) হাইড্রোপিক ডিজেনারেশন,
(৪) ফ্যাটি ডিজেনারেশন,
(৫) লিপয়ডাল ডিজেনারেশন,
(৬) গ্লাইকোজেন ডিজেনারেশন,
(৭) মিউকয়েড ডিজেনারেশন,
(৮) হায়েলিন ডিজেনারেশন,
(৯) এমাইলয়েড ডিজেনারেশন।

(১) ক্লাউডি সোয়েলিং (এলবুমিনাস ডিজেনারেশন)

এ জাতীয় অবক্ষয় সর্বাপেক্ষা সাধারণ। এ অবস্থায় সাইটোপ্লাজম দানাদার ও অস্বচ্ছ হওয়ায় কোষকে মেঘের মত দেখায় বলে একে ক্লাউডি সোয়েলিং বলে। কোষের দানাসমূহ আমিষ জাতীয় হওয়ায় একে এলবুমিনাস ডিজেনারেশন বলে। এরা যে আমিষ এবং চর্বি জাতীয় দ্রব্য নয় তা প্রমাণিত হয় এই ঘটনা হতে যে এরা এসেটিক এসিডে দ্রবণীয় কিন্তু চর্বিকে দ্রবীভূত করে এমন দ্রবণে এরা দ্রবীভূত হয় না।

হাইড্রোপিক ডিজেনারেশনের সাথে এদের নিবিড় সম্বন্ধ বিদ্যমান।

গাঠনিক পরিবর্তনের ধারা ঃ মূলতঃ পরিবর্তন কোষের সাইটোপ্লাজমের কাঠামোতেই বিদ্যমান। কেন্দ্রকেও পরিবর্তন ঘটে কিন্তু তা নগণ্য।

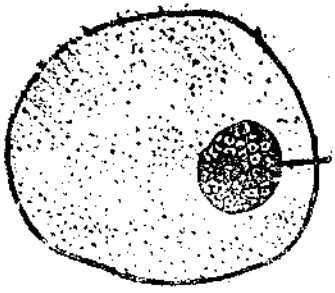

চিত্র ১ঃ ক্লাউডি সোয়েলিং বা এলবুমিনাস ডিজেনারেশন

সাইটোপ্লাজমের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন অঙ্গে বিভিন্ন পরিবর্তন চোখে পড়ে। মসৃণ ও অমসৃণ এনডোপ্লাজমিক রেটিকিউলিন, গলগি এপারেটাস, মাইটোকনড্রিয়া, লাইজোম এসব অঙ্গের অন্যতম।

মাইটোকনড্রিয়া পানি জমার ফলে স্ফীত হয়ে উঠে। অক্সিজেনজনিত ফসফোরাইলেশন সংঘটিত হয় এবং এ. টি. পি. উৎপন্ন হয়। এর ফলে আয়নকে নিয়ন্ত্রণকারী পাম্প অকেজো হয়ে পড়ে। যার ফলে পানি জমে ও টোনাধিক্য ঘটে। মাইটোকনড্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় কোষে পানি জমে ও স্ফীত হয়। আইরনের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণকারী এনডোপ্লাজমিক রেটিকিউলিনের আর. এন. এ. খোওয়া যাওয়াও এর উৎপত্তিতে সাহায্য করে।

আক্রান্ত অঙ্গাদি ঃ যে সমস্ত অঙ্গ অবক্ষয়ের শিকার হয় তারা হলো— যকৃত, বৃক্ক, হৃৎপিন্ড, মাংসপেশী ইত্যাদি।

আক্রান্ত অঙ্গ আকারে ও ওজনে বেড়ে যায়। কর্তিত তল স্ফীত হয়ে বাইরে বেরিয়ে থাকে।

কারণসহ ঃ অবক্ষয়ের কারণ বিবিধ, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, প্রদাহ, অন্তর্বিষ, রাসায়নিক দ্রব্য, অত্যধিক ঠান্ডা বা গরম, অক্সিজেন শূন্যতা, অপুষ্টি, রক্তপ্রবাহের স্বল্পতা, পানি জমা বা পানিবদ্ধতা।

(২) হাইড্রোপিক ডিজেনারেশন

এটা এমন এক শ্রেণীর অবক্ষয় যেখানে কোষের মধ্যে অস্বাভাবিক ও অত্যধিক পরিমাণ পানি জমে। এ অবস্থার সাথে ক্লাউডি সোয়েলিং নিবিড়ভাবে

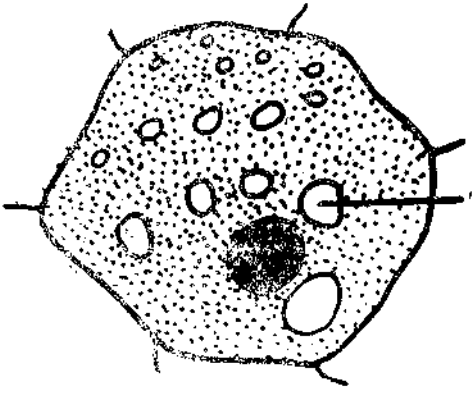

চিত্র ২ ঃ হাইড্রোপিক ডিজেনারেশন

জড়িত। যে কারণে ক্লাউডি সোয়েলিং সংঘটিত হয় তা যদি আরও শক্তিশালী হয় অথবা দীর্ঘ সময় স্থায়ী হয় তবে হাইড্রোপিক ডিজেনারেশনের সৃষ্টি হয়। কোষঝিল্লীর ভেদ্যতায় বিঘ্ন ঘটার ফলে কোষের অভ্যন্তরে পানি

জমে। সাথে সাথে পটাশিয়াম আয়ন কোষের বাইরে বের হয় ও সোডিয়াম কোষের ভেতরে বেশী পরিমাণে প্রবেশ করে। প্রধানত মাইটোকনড্রিয়া বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে পানি জমে ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

আক্রান্ত কোষসমূহ স্ফীত ও পানিতে ভরপুর হয় ও তাদের ফ্যাকাশে দেখায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখলে দেখা যায় সাইটোপ্লাজমে পরিষ্কার ফাঁকা এলাকা বিদ্যমান এবং নিউক্লিয়াস কোষের একধারে ঠেসা অবস্থায় বিরাজমান।

যে সমস্ত অঙ্গ আক্রান্ত হয়ঃ যে সমস্ত অঙ্গ সর্বাপেক্ষা বেশী আক্রান্ত হয় তা হোল বৃক্ক। এ ছাড়া যকৃতও আক্রান্ত হয়ে থাকে।

(৩) ফ্যাটি পরিবর্তন বা ফ্যাটি চেঞ্জ

প্যারেনকাইমা-কোষের মধ্যে অস্বাভাবিক মাত্রায় চর্বি বা ফ্যাট জমা হওয়াকে ফ্যাটি চেঞ্জ বলে। এদ্বারা ফ্যাটি ইনফিলট্রেশন ও ফ্যাটি ডিজেনারেশন উভয়কেই বোঝায়। ফ্যাটি ডিজেনারেশনে, কোষের অভ্যন্তরে ইতিমধ্যে বিরাজমান চর্বি বিপাকক্রিয়া ব্যাহত হওয়ার ফলে বিপাকিত হতে পারে না। ফলে দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। পক্ষান্তরে, ফ্যাটি ইনফিলট্রেশনে যে পরিমাণ চর্বিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না তার চেয়ে বেশী পরিমাণ ফ্যাট কোষে পৌঁছায়। ফলে তাদেরকে চোখে দেখা যায়।

উভয় ক্ষেত্রেই কারণ হলো কোষের অসুস্থতা। এখন প্রমাণিত হয়েছে যে, এই দুই প্রক্রিয়া পরস্পরের সাথে এত গভীরভাবে জড়িত যে এদের আলাদা করা যায় না। তাই এদের একই শিরোনামায় 'ফ্যাট মেটামরফোসিস' বলে আখ্যায়িত করা হয়। পক্ষান্তরে ওবেসিটি বা মেদবাহুল্য বলতে শুধুমাত্র অঙ্গের চর্বি-কোষের সংখ্যা ও আকার বৃদ্ধি বুঝায়।

কারণসমূহঃ ফ্যাটি চেঞ্জ-এর কারণ বিবিধ। এদের মধ্যে অন্যতম হলো—

(১) অন্তর্বিষ – যেমন রাসায়নিক দ্রব্য যথা, আরসেনিক, ফসফরাস, সোনা, রুপা, কারবন টেট্রাক্লোরাইড;

(২) এনোক্সিয়া বা অক্সিজেন স্বল্পতা;

(৩) প্রদাহ – যেমন, ইনফেকটিভ, হেপাটাইটিস (যকৃত প্রদাহ), পুঁজসৃষ্টিকারী প্রদাহ;

(৪) পুষ্টিজাত - যথা মদ্যতা, লাইপোট্রপিক হরমোনের স্বল্পতা, অভুক্ততা।

(৫) বিপাকীয় – যথা বহুমূত্র, গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিজিজ।

যে অঙ্গসমূহ আক্রান্ত হয়ঃ আক্রান্ত অঙ্গের মধ্যে যকৃত, বৃক্ক, হৃৎপিণ্ড সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

খালি চোখে দৃশ্যমান অবয়ব ঃ আক্রান্ত অঙ্গ আকারে বড় হয়, ঘনত্বে নরম হয় এবং টিপলে চর্বির মত অনুভূত হয়।

যকৃতের তলে বিশেষ করে কর্তিত তলে বিভিন্ন রংয়ের প্রচুর ছাপ বিদ্যমান।

হৃৎপিন্ডের মাংসপেশীই মূলত আক্রান্ত হয়। পরিবর্তন বিস্তীর্ণ এলাকায় অথবা জায়গার জায়গায় সংঘটিত হয়। সুস্থ ও আক্রান্ত এলাকা পালাক্রমে একের পর এক ভাবে অবস্থান করে। চর্বি জমার ফলে মায়োকারডিয়াম বা মাংসপেশীকে ছাপযুক্ত মনে হয় এবং এনডোকারডিয়ামে 'থ্রাসব্রেস্ট' সৃষ্টি করে।

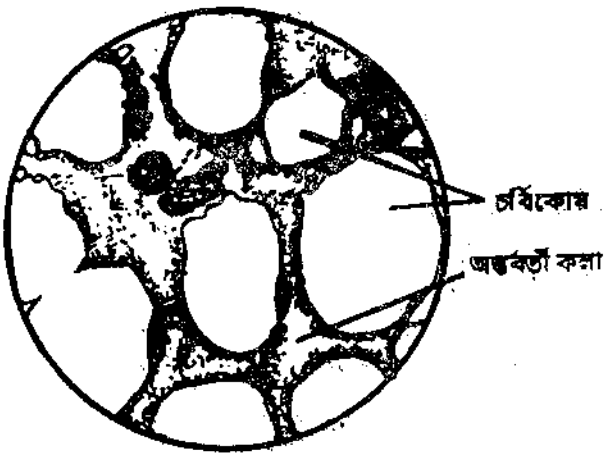

চিত্র ৩ ঃ ফ্যাটি ডিজেনারেশন

বেশী মাত্রায় বাম দিকের নিলয় আক্রান্ত হয়। পারনিসাস জাতীয় রক্ত-শূন্যতার প্রকোপ অতীত কালে বেশী থাকার ফলে এ অবস্থা বেশী দেখা যেতো। কিন্তু ইদানিংকালে এর প্রাদুর্ভাব বিরল।

আক্রান্ত বৃক্ক বড়, তুলতুলে ও ফ্যাকাশে হয়। প্রক্সিমাল টিউবিউল নর্বাপেক্ষা বেশী হারে আক্রান্ত হয় যদিও অবস্থা তীব্র হলে কালেক্টিং ও ডিসটাল টিউবিউলসমূহ ও আক্রান্ত হতে পারে।

আণুবীক্ষণিক চিত্র ঃ সমস্ত আক্রান্ত অঙ্গের ক্ষেত্রেই আণুবীক্ষণিক চিত্র সমান। কোষসমূহ চর্বি দ্বারা পরিপূর্ণ। নিউক্লিয়াস সমূহ ঠেলা খেয়ে কোষের কিনারাতে অবস্থান নেয়। রুটিন এইচ-ই রঞ্জন পদ্ধতিতে এলকোহোল ব্যবহৃত হয় যা চর্বিকে দ্রবীভূত করে ফেলে। এর ফলে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে

কোষকে পরিষ্কার ও সাদা দেখায়। চর্বিকে বিশেষ রঞ্জন পদ্ধতি দ্বারা সরাসরি প্রদর্শন করা সম্ভব। যেমন সুদান-থ্রি, সুদান-ব্ল্যাক ইত্যাদি।

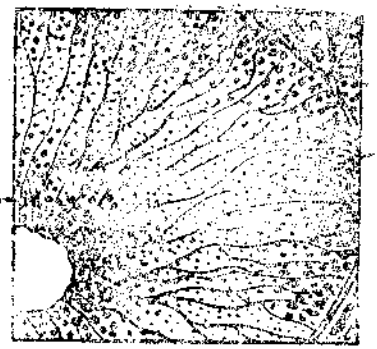

চিত্র ৪ : ফ্যাটিচেঞ্জ—লিভারের পরিবর্তন

(৪) লিপয়ডাল ডিজেনারেশন

এটা এমন শ্রেণীর অবক্ষয় যেখানে কোষের অভ্যন্তরে জড়ো হওয়া পদার্থ লিপিড্ শ্রেণীভুক্ত স্নেহ পদার্থ; নিউট্রাল ফ্যাট নয়। লিপিডের উপাদান বহুপ্রকার থাকে। এর মধ্যে কোলেসটেরোলের সাথেই এ অবস্থা সর্বাপেক্ষা বেশী বিজড়িত।

সুচ সদৃশ্য স্ফটিক, একদিক ভাঙ্গা সমতল পাত অথবা টাকু সদৃশ্য ফাটলের আকারে এরা বিরাজমান।

লিপিডের বিপাক প্রক্রিয়াতে গণ্ডগোলের ফলেই এর উৎপত্তি। এথেরোস্ক্লেরোসিস, জ্যানথোমা, হৃৎপিন্ড ও অগ্ন্যাশয়ের অন্তর্বর্তী কলায় মেদ জমা ইত্যাদি এর কয়েকটি উপমা।

(৫) গ্লাইকোজেন ডিজেনারেশন

এটা এমন এক ধরনের ডিজেনারেশন যেখানে কোষের অভ্যন্তরে অস্বাভাবিক ও অধিক মাত্রায় গ্লাইকোজেন জড়ো হয়। গ্লাইকোজেন রূপেই শর্করা দেহে সঞ্চিত থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় গ্লাইকোজেন যকৃতে, হৃৎপিন্ডে, পেশীকোষে ও প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থিতে পাওয়া যায়। এ শর্করার এক মাত্র উপাদান যা অণুবীক্ষন যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়। অবশ্য এর জন্য বিশেষ রঞ্জন পদ্ধতির প্রয়োজন। পি-এ-এস পদ্ধতি সর্বপেক্ষা উপযোগী। আইয়োডিন দ্বারা রঞ্জিত হলে এদের লালচে ধূসর দেখায়।

কারণসমূহ ঃ শর্করা বিশেষ করে গ্লাইকোজেনের বিপাক প্রক্রিয়ার গণ্ডগোলের জন্য এর উৎপত্তি। বহুমূত্র রোগে ও গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিজিজে কলাতে অধিক মাত্রায় গ্লাইকোজেন জমা হয়।

বহুমূত্র রোগে বৃক্কের টিউবিউলে গ্লাইকোজেন জমা হয়। দীর্ঘদিন-ব্যাপী মধুমেহ (glycosuria) উপস্থিত থাকার ফলে টিউবিউলের এপি-থেলিয়ামে গ্লুকোজ অধিক হারে শোষিত হয় যা গ্লাইকোজেন হিসাবে তলানি পড়ে।

গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিজিজে গ্লাইকোজেন হৃৎপিন্ড ও যকৃতে বেশী মাত্রায় জমা হয়। জন্মগতভাবে গ্লুকোজ-ডি-ফসফাটেজ বিজারক যা গ্লাইকোজেন বিপাক প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে তার অভাবই এর কারণ। কোন কোন প্রদাহে, কোষের চতুষ্পার্শ্বের কোষেও এর দেখা পাওয়া যায়।

যে সমস্ত অঙ্গ আক্রান্ত হয় ঃ যে সমস্ত অঙ্গ সাধারণতঃ আক্রান্ত হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

হৃৎপিন্ড, যকৃত, বৃক্ক ও অগ্ন্যাশয়ের আইলেট অব ল্যাংগারহ্যানসের বিটা কোষসমূহ। বিভিন্ন ভাইরাসজনিত প্রদাহে যেখানে বহিচর্মে ভেসি-কিউল সৃষ্টি হয় সেখানে বেলুন সাদৃশ্য কোষ হিসাবে এদের পাওয়া যায়। উদাহরণ, হারপিস সিমপ্লেক্স, ভেরিসেলা ইত্যাদি।

(৬) মিউকয়েড ডিজেনারেশন

যে সমস্ত ডিজেনারেশনে প্রচুর পরিমাণে মিউকাস সৃষ্টি হয় ও কোষের অভ্যন্তরে জমা হয় তাদের মিউকয়েড ডিজেনারেশন বলে।

মিউকাস হলো মিউকাস গ্রন্থি হতে নিঃসৃত এক ধরনের চটচটে আঠাল বস্তু। শ্লেষ্মা বা মিউসিন এর প্রধান উপাদান, রাসায়নিকভাবে এরা আমিষ ও শর্করা।

নিম্নলিখিতভাবে মিউকাস উৎপন্ন হয় ঃ (১) মিউকাস সৃষ্টিকারী গ্রন্থির মিউকাস ঝিল্লী হতে নিঃসৃত হয়। (২) বিশেষ ধরনের অন্তর্বর্তী কলা, যেমন আমব্রিকাস বা নাভি-নাড়ী এবং সাইনোভিয়াল মেমব্রেন বা সন্ধি ঝিল্লী হতে নিঃসৃত হয়।

এপিথেলিয়াম ও অন্তর্বর্তী কলাজনিত মিউসিন রঞ্জনপদ্ধতির ব্যাপারে একে অপর হতে ভিন্ন। প্রথমটি পি. এ. এস. ও এলিকান ব্লু দ্বারা রঞ্জিত হয়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়টি এলিকান ব্লু এবং কলয়ডাল আইরন দ্বারা রঞ্জিত হয় কিন্তু পি.এ. এস. দ্বারা রঞ্জিত হয় না। এইচ. ই. রঞ্জন দ্বারা রঞ্জিত হলে এদের নীল বা ধূসর দেখায়।

কারণসমূহ ঃ মিউকাস ডিজেনারেশন নিম্নলিখিত অবস্থায় পাওয়া যায় ঃ

(ক) যোনীপথ, শ্বাসযন্ত্র, অন্ত্রের ঝিল্লীস্তরের প্রদাহ।
(খ) মিউসিন সৃষ্টিকারী গ্রন্থির দুষ্টগ্রাহী টিউমার যেমন পাকস্থলীর কারসিনোমা।
(গ) মিকসোমা।
(ঘ) গ্রন্থি সন্ধির অসুখ।
(ঙ) মিকসোডিমা।
(চ) ডিম্বাশয়ের সিসট এডিনোমা,
(ছ) কোন কোন সময় ফাঁপা অঙ্গের অভ্যন্তরে যেমন এপেনডিক্স মিউকোসিল, অগ্ন্যাশয়ের ফাইব্রো-সিসটিক রোগ ইত্যাদিতে।

(৭) হায়েলিন ডিজেনারেশন

কোষের অভ্যন্তরে হায়েলিন-সুলভ পরিবর্তনকে হায়েলিন ডিজেনারেশন বলে। হায়েলিন বলতে বস্তুর ভৌতিক বৈশিষ্ট্য বুঝায়। হায়েলিন বস্তু

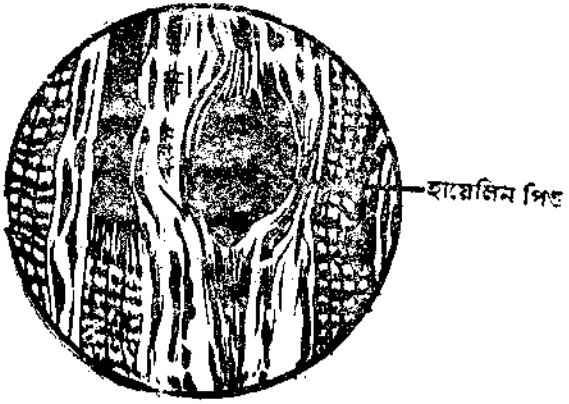

চিত্র ৫ ঃ হায়েলিন ডিজেনারেশন

স্বচ্ছ, চকচকে ও লালচে। এদের রাসায়নিক উপাদানের প্রকৃতি এখনও অজানা।

যে সমস্ত অঙ্গ আক্রান্ত হয় ঃ দেহের এপিথেলিয়াম ও অন্তর্বর্তী উভয় কলাতে এদের পাওয়া যায় যদিও দ্বিতীয়টিতে সাপেক্ষা অধিক হারে পাওয়া যায়। আক্রান্ত অংশ লালচে, সমসত্ত্ব-সম্পন্ন কোলাজেন তন্তুর পিন্ড

হিসাবে পাওয়া যায়। কোষের ভেতরে চকচকে দলা বা পিন্ড হিসাবেও এরা বিরাজ করে।

অন্তর্বর্তী কলার হায়েলিন নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া যায় ঃ

(১) রক্তনালীর দেওয়ালে আরটেরিও স্ক্লেরোসিস, বার্ধক্য, অপুষ্টি ও উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদিতে।

(২) বৃক্কের গ্লোমেরিউলাসে যেমন দীর্ঘস্থায়ী বৃক্কক প্রদাহে,

(৩) টিউমার— টিউমারের অন্তর্বর্তী কলাতে।

এপিথেলিয়াম কলার হায়েলিন নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে পাওয়া যায় ঃ

(১) ল্যাংগারহানের আইলেটএর কোষে — বহুমূত্র রোগে,

(২) প্রসটেট গ্রথির কলা বিবর্ধন — যেমন করপোরাএমাইলেসা,

(৩) কোলাজেন তন্তু— পুরান ইনফারকশন,

(৪) যকৃত কোষ— প্রদাহে (কাউসিলম্যান বডি), সিরোসিস (ম্যালোরি বডি)

জেনকারেস ডিজেনারেশন ঃ জেনকারের ডিজেনারেশন হলো হায়েলিন ডিজেনারেশনের এক উদাহরণ যা রেকটাস এবডোমিনাস পেশী, ডায়াফ্রাম ও অন্যান্য পেশীতে পাওয়া যায়। ডিপথেরিয়া ও টাইফয়েড রোগে একে পাওয়া যায়। মাংসপেশীতে আড়াআড়িভাবে স্থাপিত রেখার অবলুপ্তি ঘটে এবং তা সমসত্ত্ব-সম্পন্ন লালচে পিন্ডে পরিণত হয়। অবশেষে সেখানে কোয়াগুলেশন জাতীয় কোষ-পরিচিতি সৃষ্টি হয়।

(৮) এমাইলয়েডোসিস

দেহের বিভিন্ন অঙ্গের অন্তর্বর্তী কলায় এমাইলয়েড সুলভ বস্তুর তলানী পড়াকে এমাইলয়েডোসিস বলে।

এমাইলয়েড হলো হায়েলিনের মত এক বস্তু। যা স্বচ্ছ, ধূসর মোমের মত। অন্যান্য হায়েলিন হতে এরা নিম্নলিখিত বিষয়ে ভিন্ন ঃ

১) বিশেষ রঞ্জন পদ্ধতির প্রতি এদের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন,

২) আক্রান্ত স্থান ভিন্ন,

৩) বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এদের সৃষ্টি।

ইলেকট্রনিক মাইক্রোসকোপের নিচে এদের শাখা বিস্তাররত এক অথবা বহু তন্তু দেখা যায়। এর ফলে এক্সরে ক্রিস্টালোগ্রাফি ও ইনফ্রারেড স্পেকট্রোসকোপি মাধ্যমে দেখলে "বিপ্লেটেডসিট"-এর মত দেখায়।

বিভিন্ন রঞ্জন পদ্ধতিতে এরা বিভিন্ন রং ধারণ করে ঃ

ইয়োডিন – মেহোগোনি-সুলভ ধূসর ; কনগো রেড–গোলাপী ; মিথাইল–নীল পরিবেশে ; ভায়োলেট—গোলাপী।

রাসায়নিকভাবে এরা অত্যন্ত জটিল। পূর্বে এদের আমিষ ও পলিস্যাকারাইড বলে গণ্য করা হোত। কিন্তু এখন প্রমাণিত হয়েছে যে, এরা খাঁটি

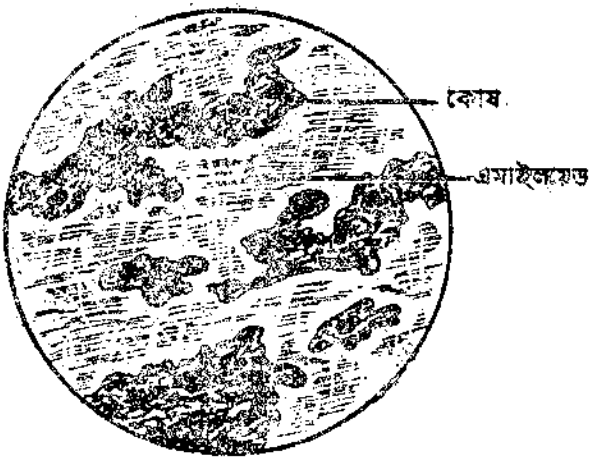

চিত্র ৬ ঃ এমাইলয়েড ডিজেনারেশন

আমিষ। তাও একক নয়, বিবিধ উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। এর মধ্যে দুটি প্রধান উপাদান হলো ঃ

১) ইমিউনো গ্লোবিউলিন লাইট চেইন— এটি ইমিউনোগ্লোবিউলিন এবং একে প্রাথমিক এমাইয়েলডোসিস ও বি সেল ডিসক্রাসিসে পাওয়া যায়।

২) নন-ইমিউনোগ্লোবিউলিন প্রোটিন— এরা গৌণ বা মাধ্যমিক এমাইলয়েডোসিসে পাওয়া যায়। এদের আণবিক ওজন ৪৫০০—৯০০০ ডালটন। এরা স্বাভাবিক রক্তের এমায়লয়েডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রোটিনের সাথে জড়িত।

শ্রেণীবিভাগ ঃ এমাইলয়েডোসিসকে বিভিন্নভাবে শ্রেণী বিভক্ত করা হয়। এ সম্বন্ধে সর্বজনস্বীকৃত কোন পদ্ধতি নেই। নিম্নলিখিত পরিকল্পনা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে ঃ

১) প্রাথমিক এমাইলয়েডোসিস— এর পিছনে কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এটা (ক) ব্যাপ্ত, (খ) স্থানীয়।

২) মাধ্যমিক এমাইলয়েডোসিস— এর জন্য দায়ী কোন না কোন কারণ পাওয়া যায়। যেমন (ক) রিউমেটয়েড আরথ্রাইটিস, (খ) কুষ্ঠরোগ ইত্যাদি।

৩) বংশানুক্রমিক ও পারিবারিক এমাইলয়েডোসিস — এর অন্তর্গত কয়েকটি সিনড্রম বিদ্যমান যেমন ঃ

ক) ফ্যামিলিয়াল এমাইলয়েড-- পলি-নিউরোপ্যাথী।
খ) ফ্যামিলিয়াল এমাইলয়েড হার্ট ডিজিজ।
গ) আরটিকেরিয়া ডেফনেস নিউরোপ্যাথী।
ঘ) ফ্যামিলিয়াল কিউটেনিয়াস এমাইলয়েড।
ঙ) ল্যাটিস করনিয়াল ডিসট্রফি।

৪) মালটিপল মায়েলোমার সাথে জড়িত এমাইলয়েডোসিস— এ ক্ষেত্রে যদিও মালটিপল মায়েলাইটিসের পর দেখা দেয় কিন্তু এর অবস্থান সবদেহ ব্যাপী।

৫) সেনাইল এমাইলয়েডোসিস।
৬) টিউমারে তলানী পড়া এমাইলয়েড।

প্রাথমিক এমাইলয়েডোসিসঃ এ ক্ষেত্রে এমাইলয়েড সৃষ্টিকারী কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। প্যারেনকাইমা কলার চেয়ে মেসেনকাইমা কলাতে এ বেশী হয়। বিস্তীর্ণভাবে এ বিরাজ করতে পারে।

যে সমস্ত অঙ্গ আক্রান্ত হয়ঃ সর্বাপেক্ষা বেশী হারে যে সমস্ত অঙ্গ আক্রান্ত হয় তাদের নাম হলো— চামড়া,হৃৎপিন্ড, ল্যারিঙ্গ, এসোফেগাস, পাকস্থলী অন্ত্র, বৃক্ক ইত্যাদি।

মাধ্যমিক এমাইলয়েডোসিসঃ এ ক্ষেত্রে এমাইলয়েড তলানী পড়ার নির্দিষ্ট কারণ বিদ্যমান থাকে।

যে সমস্ত অঙ্গ আক্রান্ত হয়ঃ যে সমস্ত অঙ্গ সাধারণতঃ আক্রান্ত হয় তারা হলো-- প্লীহা, বৃক্ক, এড্রিনাল গ্রন্থি, অগ্ন্যাশয়, লসিকা গ্রন্থি।

যে সমস্ত অবস্থায় এদের পাওয়া যায়ঃ দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ যেমন,যক্ষা, কুষ্ঠরোগ, অস্থি প্রদাহ, রিউমেটয়েড আরথ্রাইটিস ইত্যাদিতে সাধারণতঃ এদের পাওয়া যায়। এ ছাড়া হজকিনের অসুখেও এদের পাওয়া যায়।

প্যাথলজীজনিত পরিবর্তন

আক্রান্ত কলা স্ফীত এবং সমসত্ত্ব হয়। প্যারেনকাইমাল কলা শীর্ণ হয়ে পড়ে। রক্তনালীর দেওয়াল ঘন ও পুরু হয় এবং নালীর অভ্যন্তর সরু হয়ে পড়ে।

প্লীহাঃ আক্রান্ত প্লীহা বড়, শক্ত, ফ্যাকাশে ও স্থিতিস্থাপক হয়। এরা দু'প্রকারে আত্মপ্রকাশ করে থাকেঃ

(ক) লসিকা কলার ফলিকিউলের রক্তনালীতে স্থানীয়ভাবে বিরাজ করে যার ফলে প্লীহাতে সাগুদানাসাদৃশ্য দানার মত দেখায়। একে 'সাগুপ্লীহা' বলে।

(খ) বিস্তৃতভাবে বিরাজ করে যার ফলে প্লীহাকে শূকরের চর্বির মত দেখা যায়।

বৃক্ক ঃ টিউবিউল ও গ্লোমেরিউলাসে এমাইলয়েডের তলানী পড়ে। আর্টারী ও আরটেরিওলের দেওয়াল সর্বপ্রথম আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত বৃক্কের আকার স্বাভাবিক অথবা শেষের দিকে ছোট হতে পারে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা বড়, ফ্যাকাশে, ধূসর এবং দৃঢ় হয়ে পড়ে।

বৃক্কের গ্লোমেরিউলাসসমূহ, টিউবিউলের চতুষ্পার্শ্বের অন্তর্বর্তী কলা ও রক্তনালীর দেওয়াল আক্রান্ত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে গ্লোমেরিউলাসে স্থানে স্থানে অথবা বিস্তীর্ণভাবে এমাইলয়েডের তলানী পড়ে। সাথে সাথে ক্যাপিলারীর বেসমেন্ট ঝিল্লী দানার মত দৃঢ় হয়। অবশেষে ক্যাপিলারী টাফ্ট মুছে যায়। অন্তর্বর্তী কলায় এমায়লয়েড তলানী পড়ায় টিউবিউলের অভ্যন্তরে কাস্ট জমা হয়।

বৃক্কে এমায়লয়েডের ফলে নেফরোটিক সিনড্রম সৃষ্টি হতে পারে।

হৃৎপিণ্ড ঃ বৃদ্ধ বয়সে সাধারণভাবে ও বিস্তীর্ণভাবে সংঘটিত এমাইলয়েডোসিসের অংশ হিসাবে হৃৎপিন্ড আক্রান্ত হতে পারে। অথবা শুধুমাত্র হৃৎপিন্ডেই এ সংঘটিত হয়ে থাকে।

যকৃত ঃ এনডোথেলিয়াম ও যকৃত কোষের অন্তর্বর্তী স্থানে এমায়লয়েড তলানী পড়ে। আক্রান্ত যকৃত বড়, দৃঢ় ও আধাস্বচ্ছ হয়। আণুবীক্ষণিকভাবে এইচ. ও. ই. রঞ্জন পদ্ধতি দ্বারা এদের প্রদর্শন করা সম্ভব।

কোষ-পচিতি

(নেকরোসিস)

সংজ্ঞা ঃ জীবন্ত শরীরের স্থানীয়ভাবে পরিবেষ্টিত এক বা একাধিক কোষের মৃত্যু ও তার ফলে গাঠনিক পরিবর্তন যা দেখে মৃত্যুকে নির্ণয় করা যায় তাকে কোষ-পচিতি বলে। বায়োপ্সি পদ্ধতি দ্বারা দেহ হতে কলা অপসারণ করার পর কলার মৃত্যু হতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে, কলাস্থ বিজারক কোষ-বস্তুর উপর প্রভাব বিস্তার করার সময় পায় না। ফলে তারা কলা কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। পক্ষান্তরে কোষ-পচিতির ক্ষেত্রে, মৃত কোষসমূহ দেহে অবস্থিত থাকার ফলে বিজারকের শিকার হয়। যার ফলে কোষ-কাঠামোর মারাত্মক পরিবর্তন ঘটে।

দেহের সমগ্র কলার মৃত্যুকে সোমাটিক ডেথ বলে। পক্ষান্তরে কোষ-পচিতি হলো দেহের অংশবিশেষের মৃত্যু।

কোষ-পচিতিতে কোষে যে-সমস্ত পরিবর্তন সাধিত হয় তা নিম্নলিখিত উপায়ে সৃষ্ট হয় :

(ক) বিজারক দ্বারা কোষের হজম হওয়া : মৃত কোষের সাইটোপ্লাজমের লাইসোজোমসহ বিজারক দ্বারা সৃষ্ট বিনষ্টিকে অটোলাইসিস বলে। যখন এই বিজারক নিউট্রোফিল হতে নিঃসৃত হয়, তখন তাকে হেটারোলাইসিস বলে।

(খ) প্রোটিন ডিন্যাচুরেশন দ্বারা কাঠামোজনিত পরিবর্তন : কোষ-পচিতির ফলে উদ্ভূতকাঠামোর পরিবর্তন খালি চোখে ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে দেখা যায়।

খালি চোখে দৃশ্যমান অবয়ব : শ্রেণীবিভাগ অধ্যায়ে একে বর্ণনা করা হয়েছে।

অণুবীক্ষণিক চিত্র : কোষ-পচিতির আণুবীক্ষণিক চিত্র গুরুত্বপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম, উভয়ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তন বিদ্যমান। কিন্তু নিউক্লিয়াসের পরিবর্তন অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

নিউক্লিয়াসএ পরিবর্তন : নিউক্লিয়াসের তিন প্রকার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় :

(ক) **পিকনোসিস**– এ ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসের ক্রোমাটিন কেন্দ্রীভূত হয়ে তীক্ষ্ণভাবে রঞ্জিত ছোট এক বিন্দুতে পরিণত হয়। প্রোটিন হাইড্রোলাইসিস হওয়ার ফলে নিউক্লিক এসিড সৃষ্টি হয় বা বেসিক রঞ্জনের সাথে গাঢ়ভাবে রঞ্জিত হয়।

(খ) ক্যারিওহেকসিস : নিউক্লিয়াসের ক্রোমাটিনসমূহ ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায় এবং ছোট ছোট ভগ্নাংশ হিসাবে বিরাজ করে। ইনফারকশন যুক্ত এলাকার কিনারে এ ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

(গ) ক্যারিওলাইসিস : একে ক্রোমাটোলাইসিসও বলে। ধীরে ধীরে ক্রোমাটিন অস্পষ্ট হয়ে অদৃশ্য হয়। এ ধরনের পরিবর্তন সর্বাপেক্ষা সাধারণ।

সাইটোপ্লাজমের পরিবর্তন : সাইটোপ্লাজম স্ফীত হয় এবং তার নিজস্ব জালের মত চেহারা নষ্ট হয়ে সমসত্ত্ব রূপ ধারণ করে। কিনারার

স্বাভাবিকত্ব বিনষ্ট হয়। কখনও কখনও সাইটোপ্লাজমের আয়তন বেড়ে যায় এবং বেলুনের আকার ধারণ করে।

শ্রেণীবিভাগ

কোষ-পচিতিকে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ

(ক) খালিচোখে দৃশ্যমান অবয়ব,
(খ) অণুবীক্ষণিক চিত্র,
(গ) আক্রান্ত স্থান।

(ক) **খালি চোখে দৃশ্যমান অবয়ব ও অণুবীক্ষণিক চিত্রের ভিত্তিতে** এদের নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ—

(১) কোয়াগুলেটিভ, (২) ক্যাসিয়েটিভ, (৩) কোয়ালিকেটিভ,
(৪) ফ্যাট নেকরোসিস।

(১) **কোয়াগুলেটিভ** ঃ এ শ্রেণীর কোষ-পচিতি ই সর্বাপেক্ষা সাধারণ। রক্তাল্পতাপ্রসূত অবস্থার জন্য এর সৃষ্টি। সাধারণতঃ হৃৎপিন্ড, বৃক্ক, প্লীহা আক্রান্ত হয়।

আক্রান্ত অংশ শুষ্ক, সমসত্ত্ব ও অস্বচ্ছ হয়ে পড়ে। কোষের অভ্যন্তরে বিদ্যমান বিজারকের প্রভাবে সাইটোপ্লাজম জমাট বাধে। কাঠামোর রূপরেখা বিদ্যমান থাকে কিন্তু অভ্যন্তরের সূক্ষ্ম অংশ বিলুপ্ত হয়। বিজারকের প্রোটিন ডি-ন্যাচুর হয়ে যায়। ফলে সাইটোপ্লাজম নরম হতে পারে না। এ অবস্থা দীর্ঘকালব্যাপী স্থায়ী থাকে। পরে অবশ্য প্রোটিন বিনাশকারী বিজারকের প্রভাবে শোষিত হয়। ক্যালসিফিকেশনও সংঘটিত হতে পারে।

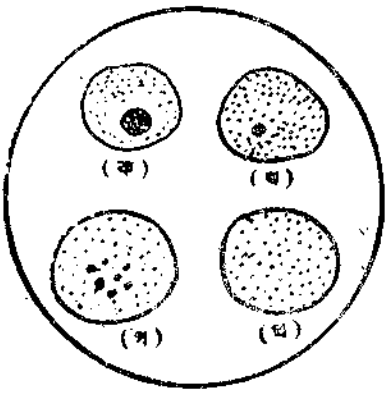

ক—সুস্থ কোষ
খ—পিকিনোসিস
গ—ক্যারিওহেকসিস
ঘ—ক্যারিওলাইসিস

চিত্র ৭ ঃ কোষ-পচিতির ফলে সৃষ্ট নিউক্লিয়াসের পরিবর্তন

(২) ক্যাসিয়েটিভ ঃ এই শ্রেণীর কোষ-পরিচিতি যক্ষা ও অন্যান্য গ্রানুলোমা জাতীয় প্রদাহ যেমন, সিফিলিসে পাওয়া যায়। এতে কোষের গাঠনিক কাঠামো সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে শুষ্ক পনীরের রূপ ধারণ করে। অনেক

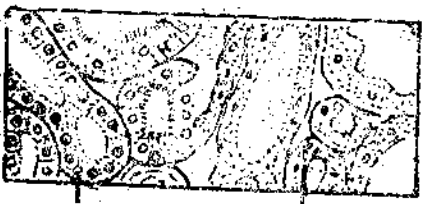

চিত্র ৮ ঃ রক্তে কোষ-পরিচিতিজনিত পরিবর্তন

ক্ষেত্রে ক্যালসিয়ামের তলানী পড়ে। এর সাথে যদি পলিমরফ নিউট্রোফিলের অনুপ্রবেশ ঘটে তবে স্থানটি নরম হয়ে পড়ে। এটা ঘটার কারণ হলো টিউবারকিউল ব্যাসিলাস দ্বারা সৃষ্ট দ্রব্য যেমন টিউবারকিউলো প্রোটিনের বিরুদ্ধে হাইপার সেনসিটিভিটি প্রতিক্রিয়ার উৎপত্তি।

এইস্থানে রক্তালপতা বিদ্যমান থাকার কারণে নিউট্রোফিল বা পলিমরফ শ্বেত কণিকা বেশী সংখ্যায় পৌঁছাতে পারে না।

(৩) লিকুইফ্যাকশন বা কোয়ালিকেটিভ ঃ যেখানে অটোলাইটিক বিজারকের প্রভাবে কোষসমূহ সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হয় সেখানে এ ধরনের কোষ-পরিচিতি ঘটে। আক্রান্ত এলাকা নরম ও তরল হয়ে পড়ে। পরে তরল পদার্থ বিশোষিত হওয়ার ফলে গর্ত বা জলকোষের সৃষ্টি হয়। স্নায়ুতন্ত্র সর্বাপেক্ষা বেশী হারে আক্রান্ত হয়। অন্য আর যে অঙ্গ উল্লেখযোগ্যভাবে আক্রান্ত হয় তা হলো অগ্ন্যাশয়। হেমোরহেজিক প্যানক্রিয়াটাইটিস ব্যারামে তীব্রভাবে লিকুইফ্যাকশন শ্রেণীর কোষ-পরিচিতি ঘটে। এ ছাড়া অন্যান্য অঙ্গেও যখন একসাথে গৌণ প্রদাহ বিদ্যমান থাকে তখন এর শিকার হতে পারে। ক্যাসিয়াজ বস্তুও তরল হয়ে এ অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে।

(৪) ফ্যাট নেকরোসিস ঃ ফ্যাট বা চর্বির দ্বারা সৃষ্ট উত্তেজনার ফলে উদ্ভূত কোষ-পরিচিতিকে ফ্যাট নেকরোসিস বলে। এ দুপ্রকারের ঃ

(অ) এনজাইমেটিক বা বিজারকজাত

(আ) ট্রমাটিক বা আঘাতজনিত।

(অ) এনজাইমেটিক ঃ তীব্র ও তাৎক্ষণিক অগ্ন্যাশয় প্রদাহে লাইপেজ গ্রন্থির বাহিরে বের হয়, যা দেহের বা চর্বি-আধারে যেমন ওমেনটাম ইত্যাদিতে

উত্তেজনা সৃষ্টি করে ফ্যাটনেকরোসিস সংঘটিত করে। আক্রান্ত এলাকা সাদা ও অস্বচ্ছ হয়ে ওঠে। লাইপেজ ইনটেরিফায়েড ফ্যাটকে হাইড্রোলাইস করার ফলে ফ্যাটি আসিড তৈরী করে বা কোষের বাইরে বেরিয়ে পড়ে। শুধু কোষ ঝিল্লী ডিমের ছালের মত অক্ষত থাকে। ফ্যাটি আসিড ক্ষারীয় লবণের সাথে মিশে সাবান বা সোপ সৃষ্টি করে যা কোষ-পচিতিযুক্ত স্থানে খড়িমাটির মত তলানী পড়ে। কোষ-পচিতির চতুষ্পার্শ্বে প্রচুর শ্বেতকণিকার অনুপ্রবেশ ঘটে। মৃত্যুর পরও ফ্যাট নেকরোসিস সংঘটিত হতে পারে। শ্বেতকণিকার অনুপ্রবেশই মৃত্যুর পূর্বে সংগঠিত ফ্যাট নেকরোসিসকে মরণোত্তর ফ্যাট নেকরোসিস হতে তফাৎ করে।

(আ) ট্রমাটিক বা আঘাতজনিত ফ্যাট নেকরোসিস : চর্বিসমৃদ্ধ কলা যেমন স্তন যখন আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তখন চর্বি কোষমুক্ত হয়ে বাহিরে বের হয় ও ফ্যাট নেকরোসিস সৃষ্টি করে। সাথে সাথে প্রদাহ হয়। নিউট্রাল ফ্যাট ভক্ষণকারী ম্যাকরোফেজ (ফোমসেল), ফরেন বডি, জায়েন্ট সেল ও অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ কোষের অনুপ্রবেশ ঘটে।

(খ) আক্রান্ত স্থানের ভিত্তিতে কোষ পচিতিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় :

(১) ফোকাল—এ ক্ষেত্রে কোষ-পচিতি সুস্থ কোষসমূহের মধ্যে মাত্র গোটাকয়েক কোষ বিদ্যমান। টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, সেপ্টিসেমিয়া ইত্যাদি প্রদাহে জটিলতা হিসাবে হৃৎপিন্ড ও অন্যান্য অঙ্গে এ অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। কোষ-পচিতিযুক্ত এলাকা আর, ই, টিসু দ্বারা অপসারিত হয়, নতুবা তন্তু-কলা অথবা নূতন রিজেনারেটেড কোষ দ্বারা স্থলাভিষিক্ত হয়।

(২) জোনাল —এ যকৃতে দেখা যায়। যকৃতের লোবেউল বিভিন্ন অঞ্চলে কোষ-পচিতি দেখা যায়। ক্লোরোফরম বিষাক্ততায় লোবেউলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে, অগ্নিদগ্ধতা ও হলুদ রোগে মধ্যবর্তী অঞ্চলে, একলেমসিয়া ও ফসফরাস বিষাক্ততায় বহির্ভাগে কোষ-পচিতি দেখা দিতে পারে।

কারণসমূহ : কোষ-পচিতির কারণ বহু। এদের নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে :

(১) হাইপোক্সিয়া ও অ্যানোক্সিয়া : অক্সিজেনের স্বল্পতা ও অক্সিজেনহীনতা— অক্সিজেনের অভাবে কলার যসপোরাইলেশন হয় না। যে সমস্ত অবস্থায় এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তারা হলো—থ্রমবোসিস বা রক্ত জমাট বাঁধা, এমবোলিসম, ইনফারকশন, রক্তবন্ধতা বা কনজেশন, আরটেরিও স্ক্লেরোসিস, এথেরোমা, বার্ধক্য।

(২) ব্যাকটেরিয়াজাত অন্তর্বিষ : কারবালংক, নোমা ইত্যাদি।
(৩) রাসায়নিক পদার্থ : কড়া এসিড বা ক্ষার, ফসফরাস, কুইনিন, বেনজিন।
(৪) ভৌতিক : দারুণ ঠান্ডা বা গরম; অগ্নিদগ্ধতা, ফ্রসটবাইট, এক্সরে।
(৫) ইমিউনিটির বিশৃঙ্খলতা।
(৬) জেনেটিক গন্ডগোল।

কোষ-পরিণতি (Sequle) : নিম্নরূপ পরিণতি—

(১) প্রদাহ সৃষ্টি,
(২) গ্র্যাংগ্রিন,
(৩) ক্যালসিয়াম তলানী,
(৪) হিলিং

নেকরোবায়োসিস

নেকরোবায়োসিস বলতে এমন এক প্রক্রিয়াকে বুঝায় যেখানে জীবন্ত শরীরের অংশ হিসাবে থাকাকালীন অবস্থায় কোষসমূহে ধীরে ধীরে এবং ক্রমান্বয়ে অবক্ষয় ঘটে এবং অবশেষে তাদের কোষ-পচিতিতে শেষ হয়। এ ক্ষেত্রে কোষ-পচিতির পূর্বে অবক্ষয় বিদ্যমান কিন্তু (মূল) নেকরোসিসে অবক্ষয় বিদ্যমান

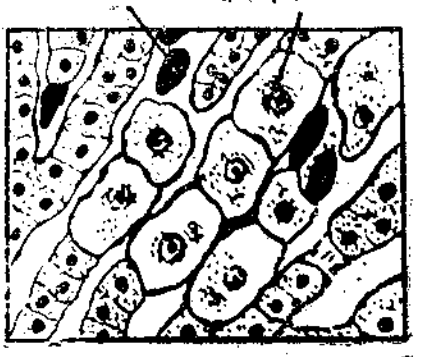

সুস্থকোষ কোষপচিতি

চিত্র ৯

থাকতেও পারে বা নাও থাকতে পারে। এটা দেহের স্বাভাবিক কোষের সৃষ্টি ও মৃত্যুর সাথে জড়িত। এজন্য একে ফিজিওলজীজনিত কোষের মৃত্যু বলে গণ্য করা হয়।

গ্যাংগ্রীন

পচা কোষে যখন গলন সৃষ্টি হয় তখন তাকে গ্যাংগ্রীন বলে। গলন সৃষ্টি কারী জীবাণু যা শুধুমাত্র মৃত কোষে বসবাস করে তা দ্বারা গ্যাংগ্রীন সংঘটিত হয়।

আক্রান্ত স্থান ঃ যে সমস্ত স্থানে গ্যাংগ্রীন সৃষ্টি হতে পারে তারা হলো ঃ চামড়া, মুখগহবর, অন্ত্র, ফুসফুস, জরায়ুর সারভিক্স। এদের আক্রান্ত হবার মুখ্য কারণ হলো এ সমস্ত স্থানে প্রচুর পরিমাণ গলন সৃষ্টিকারী জীবাণুর অবস্থান।

হৃৎপিন্ড, প্লীহা অথবা যকৃতে গ্যাংগ্রীন হয় না। কারণ এসব অঙ্গে গলন সৃষ্টিকারী জীবাণু থাকে না।

দায়ী জীবাণুসমূহ ঃ যে সমস্ত জীবাণু গ্যাংগ্রীন সৃষ্টির জন্য দায়ী তারা হলো—অবায়ুজীবী স্ট্রেপটোকক্কাস, ক্লসট্রিডিয়াম, ব্যাকটেরয়েড ইত্যাদি। এ সমস্ত ব্যাকটেরিয়া স্ট্রেপটোকক্কাস পায়োজেনিস, স্ট্যাফাইলোকক্কাস ও কলিফরম এর সাথে মিলে গ্যাংগ্রীন সৃষ্টি করে।

শ্রেণীবিভাগ ঃ মূলতঃ গ্যাংগ্রীন তিন প্রকারের ঃ

ক) শুষ্ক গ্যাংগ্রীন,
খ) সিক্ত গ্যাংগ্রীন,
গ) গ্যাস গ্যাংগ্রীন।

(ক) শুষ্ক গ্যাংগ্রীন ঃ দেহের যে সমস্ত অংশে রক্তপ্রবাহ খুব কম এবং এত শুষ্ক যে জীবাণু ভাল করে জন্মাতে পারে না সে সমস্ত স্থানে এ ধরনের গ্যাংগ্রীন পাওয়া যায়। হাত ও পায়ে রক্তনালী সংকোচনের ফলে সৃষ্টি রক্তাল্পতার জন্য এর সৃষ্টি হয়।

আক্রান্ত এলাকা ঠান্ডা, শুষ্ক কোচকানো হয় এবং সবুজ এবং অবশেষে কালো রং ধারণ করে। কালো রং এর কারণ নিম্নরূপ ঃ

গলন সৃষ্টিকারী জীবাণু হাইড্রোজেন সালফাইড উৎপন্ন করে যা লোহিত কণিকা হতে বেরিয়ে-পড়া হেমোগ্লোবিউলিনের উপর প্রভাব সৃষ্টি করে সালফাইড অব ইরন সৃষ্টি করে। এবং রং কালো হওয়ায় কণাকে কালো দেখায়।

আক্রান্ত স্থানের রক্তনালী স্পন্দনহীন হয়ে পড়ে। গ্যাংগ্রীনের পরিধি উপরের দিকে বাড়তে থাকে যে পর্যন্ত না এমন এক স্থানে পৌঁছায় যেখানে জীবন্ত রাখার মত পর্যাপ্ত রক্তধারা উপস্থিত থাকে। এ স্থানে দু'অংশ (গ্যাংগ্রীন

ও সুস্থ) বিচ্ছিন্নকারী এক সুস্পষ্ট রেখা বিদ্যমান, যাকে লাইন অব সেপারেশন বলে।

বার্ধক্যজনিত গ্যাংগ্রীন, বেড সোর, বহুমূত্রজনিত গ্যাংগ্রীন এবং বারজায়ের অসুখ এর কয়েকটা উপমা।

চিত্র ১০ (ক)

(খ) **সিক্ত গ্যাংগ্রীন ঃ** যে সমস্ত অংশ প্রচুর পরিমাণে সিক্ত সে সমস্ত অংশ এই প্রকার গ্যাংগ্রীনের শিকার হয়ে থাকে। দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহেই এদের পাওয়া যায় যেমন অন্ত্র, ফুসফুস ইত্যাদি। দেহের বাইরেও একে পাওয়া যায় যদি স্থানটা সিক্ত হয়, যেমন, ভালভা, ভাজাইনায় মুখ ইত্যাদি।

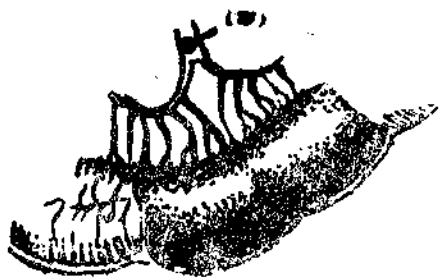

চিত্র ১০ (খ)

আক্রান্ত অংশ পচে গলে যায়। গলন সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া দ্বারা দুর্গন্ধময় গ্যাস যেমন ইনডোল, স্কাডোল ইত্যাদি তৈরী হয়, চামড়ার উপর ফোসকা পড়ে এবং চাপ দিলে ভাঙ্গা ভাঙ্গা আওয়াজ হয়। শুষ্ক গ্যাংগ্রীনের মত এখানে তেমন বিভক্তকারী রেখা গঠিত হয় না। গ্যাংগ্রীনের বিস্তার দ্রুত হয়। বিষাক্ত অভিষিষ দেহে শোষিত হওয়ার ফলে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করে।

(গ) গ্যাস গ্যাংগ্রীন ঃ এ এক প্রকার বিশেষ ধরনের গ্যাংগ্রীন যা ক্লসট্রিডিয়াম ওয়েলসি ও অন্যান্য ক্লসট্রিডিয়াম দ্বারা সৃষ্টি হয়। এ ধরনের গ্যাংগ্রীন অতীতকালে যুদ্ধ-বিগ্রহে ও সড়ক দুর্ঘটনায় প্রায়ই পাওয়া যেতো। কারণ ধুলা ক্লসট্রিডিয়াম দ্বারা দূষিত থাকতো। ক্ষোষ-পচিতিযুক্ত অবায়ুজীবী ক্লসট্রিডিয়াম দ্বারা কলা গলিত ও বিকৃত হয়।

ইদানিং কালে এন্টিবায়োটিকের সুযোগ থাকায় এ অবস্থা বড় একটা দৃষ্টিগোচর হয় না।

পোস্টমরটেম চেঞ্জ
(মরণোত্তর পরিবর্তন)

মৃত্যু বলতে দেহের সামগ্রিক মৃত্যু বুঝায়। মৃত্যুর পর দেহে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের ধরন সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন। কারণ তাতে নিম্নলিখিত সুবিধা হয় ঃ

(১) মৃত্যুর সময়কাল নির্ধারণ করার এর প্রয়োজন,

(২) অটোপসিতে পাওয়া পরিবর্তন ভালোভাবে বুঝার জন্য এর প্রয়োজন।

পরিবর্তনসমূহ ঃ দেহের মরণোত্তর পরিবর্তন হলো ঃ (১) রাইগর মরটিস, (২) গলন এবং পচন ও (৩) এলগর মরটিস।

(১) রাইগর মরটিস

মৃত্যুর পর দেহের মাংসপেশীসমূহ এত সংকুচিত হয় যে অস্থিসন্ধি ভালভাবে মোড়া যায় না। এ অবস্থাকে রাইগর মরটিস বলে। সাধারণতঃ ৬—১০ ঘন্টা পর এ অবস্থা শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে এবং ৪৮ ঘন্টায় সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছায়। এরপর সংকোচন ধীরে ধীরে অপসারিত হয় এবং পরবর্তী ৪৮ ঘন্টা পর পেশীসমূহ পূর্ণভাবে শিথিল হয়ে পড়ে।

উপরোল্লিখিত পরিবর্তনের সময়-সূচী নিম্নলিখিত নিয়ামকের উপর নির্ভরশীল ঃ

(ক) তাপ মাত্রা--গ্রীষ্মকালে তাড়াতাড়ি সংঘটিত হয়।

(খ) মৃত্যুর সময় পেশীর শারীরিক পরিশ্রম—মৃত্যুকালে পেশী যদি কর্মরত অবস্থায় থাকে তবে রাইগর মরটিস তাড়াতাড়ি সংঘটিত হয়।

(গ) দেহে গ্লাইকোজেনের পরিমাণ—হৃষ্টপুষ্ট প্রাণীর ক্ষেত্রে রাইগর মরটিস দেরীতে সংঘটিত হয়।

রাইগর মরটিস চোয়াল, মাথা, গর্দানের মাংসপেশী হতে শুরু হয় এবং ক্রমান্বয়ে ঊর্ধ্বাঙ্গ ও নিম্নাঙ্গের পেশীতে বিস্তার লাভ করে। হৃৎপিন্ড, অন্ত্রনালী ও মূত্রাশয়েও এটা সংঘটিত হয়।

রাইগর মরটিস সৃষ্টির কারণ হলো এ-টি-পি যা পেশীর শিথিলিকরণের জন্য প্রয়োজনীয় তার অভাব। প্রথমে প্রচুর পরিমাণে এ-টি-পি-নিঃসৃত হয় কিন্তু গ্লাইকোজেন-চক্র পুনঃ সংশ্লেষণ দ্বারা সে অভাব পূরণ হয়। এজন্য পুষ্ট প্রাণীর বেলায় রাইগর মরটিস শুরু হতে বিলম্ব ঘটে। গ্লাইকোজেন যখন নিঃশেষ হয়ে যায়, এ-টি-পি-র পুনঃ সংশ্লেষণের মাত্রা তার ব্যবহারের সাথে সঙ্গতি রাখতে ব্যর্থ হয়। ফলে রাইগর মরটিস দেখা দেয়।

(২) গলন ও পচন

মৃত্যুর পর দেহের কলা গলে ও পচে যায়। এ দু'রূপে অস্বপ্রকাশ করে থাকে :

(ক) রংয়ের পরিবর্তন,
(খ) গলিত হওয়া।

(ক) রংয়ের পরিবর্তন : মৃত্যুর পরপর দেহের রং লাল হয়। কারণ দেহের কলা রক্ত-রঞ্জন দ্বারা রঞ্জিত হয়।

দেহের নিম্নাংশে ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এ রং দেখা দেয় কারণ এ সমস্ত স্থানেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে রক্ত জমা হয়। দশ হতে বার ঘন্টা পর্যন্ত এই রংয়ের স্থান পরিবর্তন হতে পারে। কারণ এই সময় পর্যন্ত এরা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে থাকে।

রক্তদূষিতা বা সেপ্টেসিমিয়ার (septicaemia) : ক্ষেত্রে রং আরো প্রকট হয়। কারণ রক্তদূষিতার লোহিত কণার বিনষ্টি বেশী হয়।

গলন প্রক্রিয়া শুরু হলে শবভুক ব্যাকটেরিয়া হাইড্রোজেন ডাইসালফাইড উৎপন্ন করে যা বিনষ্ট হেমোগ্লোবিউলিনের আয়রনের সাথে বিক্রিয়ার ফলে সালফাইড অব আয়রন সৃষ্টি হয় যা কলাকে কালো রংয়ে রঞ্জিত করে।

(খ) গলন : মৃত্যুর পর দেহ ধীরে ধীরে নরম হয় এবং অবশেষে কলা হতে নিঃসৃত উৎসেচক ও গলন সৃষ্টিকারী জীবাণুর প্রভাবে কলা তরল হয়ে পড়ে। পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র ফেটে যায় ও আধেয় বাইরে বের হয়ে পড়ে। গ্যাস সৃষ্টি হয় যার ফলে ফোস্কা ও বুদ্বুদ দৃষ্ট হয়। স্থানে স্থানে ফ্যাট নেকরোসিস দেখা যায়।

(৩) এলগর মরটিস

মৃত্যুর পর দেহের তাপমাত্রা কমতে শুরু করে ও শীতল হয়ে পড়ে। এ প্রক্রিয়াকে এলগর মরটিস বলে। শীতল হবার হার কয়েকটি নিয়ামকের উপর নির্ভরশীল :

(ক) বাইরের আবহাওয়ার তাপমাত্রা,

(খ) দেহে তাপ ধরে রাখার পদ্ধতি।

দেহের তাপমাত্রা শীতল হওয়ার নির্দিষ্ট হার আছে। প্রথম দিকে এর হার প্রতি ঘন্টায় ৩-৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট এবং পরে প্রতি ঘন্টায় ১ ডিগ্রী। ৪৮ ঘণ্টা পর দেহের তাপমাত্রা ও বাইরের তাপমাত্রা সমান হয়ে যায়।

মৃত্যুর পূর্বে ও পরে জমটের তফাৎ

মৃত্যুর পূর্বে ও পরে গঠিত রক্তজমাটের তফাৎ

মৃত্যুর পূর্বের রক্তজমাট	মরণোত্তর রক্তজমাট
১। ভঙ্গুর	১। স্থিতিস্থাপক, রবারসুলভ অভঙ্গুর
২। রক্তনালীর দেওয়ালের সাথে শক্তভাবে লেগে থাকে	২। লেগে থাকে না
৩। উঠিয়ে নিলে দেওয়ালে অমসৃণ এক স্থান সৃষ্টি হয়	৩। তেমন কোন স্থান সৃষ্টি হয় না
৪। স্তর সম্পন্ন	৪। সমস্বত্ত্ব
৫। রং হলুদ অথবা ধূসর যুক্ত সাদা	৫। গাঢ় লাল (জেলি সাদৃশ্য) অথবা হলুদ (মুরগীর চর্বি সাদৃশ্য)
৬। টেনেঁবার করলে ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়	৬। লেজের মত বেরিয়ে আসে।

২

প্রদাহ ও কোষ পুনর্নির্মাণ

প্রদাহ (Inflammation)

জীবন্ত কোষ যখন কোন আঘাত অথবা উত্তেজকের সম্মুখীন হয় তখন তা থেকে নিজেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য কলাতে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিহয় তাকে প্রদাহ বলে। এ প্রতিক্রিয়া স্থানীয়ভাবে অথবা সমস্ত দেহে সংঘটিত হতে পারে। এ কোষের আত্মরক্ষামূলক প্রক্রিয়া।

পরিবর্তন ঃ প্রদাহের কারণসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। (ক) ব্যাকটেরিয়া —স্ট্যাফাইলোকক্কাস, স্ট্রেপটোকক্কাস হেমোলাইটিকাস, গনোকক্কাস, মেনিনগোক্কাস ইত্যাদি।
(খ) ছত্রাক —ক্যানডিডা।
(গ) ভাইরাস —এডিনোভাইরাস, মিক্সোভাইরাস ইত্যাদি।
(ঘ) এনিমাল প্যারাসাইট—মাইক্রোফাইলেরিয়া।
২। (ক) অনড় পদার্থ
(খ) রাসায়নিক —ফেনোল, অম্ল, ক্ষার ইত্যাদি।
(গ) ভৌতিক —আঘাত, চাপ, বিদ্যুৎ প্রবাহ ইত্যাদি।
৩। অটো ইমিউনিটি।

প্যাথলজীজনিত পরিবর্তন ঃ প্যাথলজীজনিত পরিবর্তনকে তিন পর্যায়ে বর্ণনা করা চলে ঃ

(১) রক্তপ্রবাহজনিত পরিবর্তন,
(২) ক্ষরণজনিত পরিবর্তন,
(৩) কলাজনিত পরিবর্তন।

১। রক্তপ্রবাহজনিত পরিবর্তন

তাৎক্ষণিক প্রদাহে রক্তপ্রবাহজনিত পরিবর্তন অধিকতর লক্ষণীয়। সর্ব

প্রথম স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনার ফলে ক্যাপিলারী সমূহ সংকুচিত হয়। কিন্তু এই সংকোচন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী ও শীঘ্র চলে যায়। তারপর রক্তনালীসমূহ সংখ্যায় বৃদ্ধি পায় এবং স্ফীত হয়ে উঠে। এর কারণ রাসায়নিক। এ ছাড়া বহু ক্যাপিলারী যা এতদিন বন্ধ ছিল সেসব খুলে যায়। এর ফলে প্রদাহ স্থানে রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি পায় ও রক্তবহুতা দেখা দেয়। তীব্র ক্ষেত্রে রক্তজমাটও সৃষ্টি হয়।

রক্তনালীর স্ফীতিকরণ উত্তেজকের সরাসরি প্রভাবে অথবা রাসায়নিক বস্তুর মাধ্যমে সংঘটিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে স্নায়ুজনিত কারণও বিদ্যমান থাকতে পারে।

স্বাভাবিকভাবে রক্তের শ্বেতকণিকা ও লোহিত কণিকা রক্তপ্রবাহের মধ্যভাগ দিয়ে একত্রে মিলেমিশে প্রবাহিত হয়। একে মধ্যপ্রবাহ বা axial stream বলে। পক্ষান্তরে, প্লাজমা রক্তের সীমান্ত ভাগ দিয়ে প্রবাহিত হয়। একে plasmatic stream বা প্রান্তিক প্রবাহ বলে। রক্তপ্রবাহের স্রোতের গতি যখন কমে যায় তখন রক্ত কোষ ও প্লাজমা ধারার পার্থক্য নষ্ট হয়। কোষসমূহ বিশেষ করে নিউট্রোফিল মধ্যপ্রবাহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রান্তের দিকে সরে যায় ও রক্তনালীর দেওয়ালে তলানী হিসাবে পড়ে। প্রথমে তারা গড়াতে থাকে, পরে তলানী হিসাবে বিরাজ করে। একে pavementing of leucocyte বলে। অনুচক্রিকাও রক্তনালীর দেওয়ালে আটকে পড়ে।

রক্তনালীর দেওয়ালের কোষসমূহের সংযোগস্থল আঘাত প্রাপ্ত হয় ও ঢিলে হয়ে পড়ে। নিউট্রোফিল এর মধ্য দিয়েই সিউডোপোডা বিস্তার দ্বারা বাইরে বের হয়। একে লিউকোসাইটের এমিগ্রেশন বলে। প্রথমে পলিমরফ ও পরে মোনোসাইট বের হয়। এ ছাড়া কিছু কিছু লোহিত কণিকা ও প্লাজমা কোষও বের হয়ে পড়ে। কেউ কেউ লোহিত কণিকার বের হওয়াকেই শুধুমাত্র ডায়েপেডেসিস আখ্যায়িত করেন। লোহিত কণিকা যখন বেশী পরিমাণে নির্গত হয় তখন প্রদাহজনিত ক্ষরণ রক্তময় হয়। প্লাজমা নির্গত হবার ফলেই ক্ষরণ তরল আকার ধারণ করে।

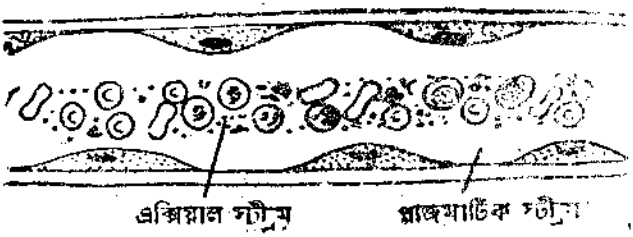

চিত্র ১১

শ্বেত কণিকার কোষ ভক্ষণের ক্ষমতা আছে। এরা আক্রমণকারী বীজাণুর

দিকে ধাবিত হয় এবং সিউডোপোডিয়া দ্বারা তাদের আত্মস্থ করে ফেলে। এছাড়া ম্যাক্রোফেজদেরও কোষভক্ষণ ক্ষমতা থাকে, যার দ্বারা তারা মৃত কোষ ও

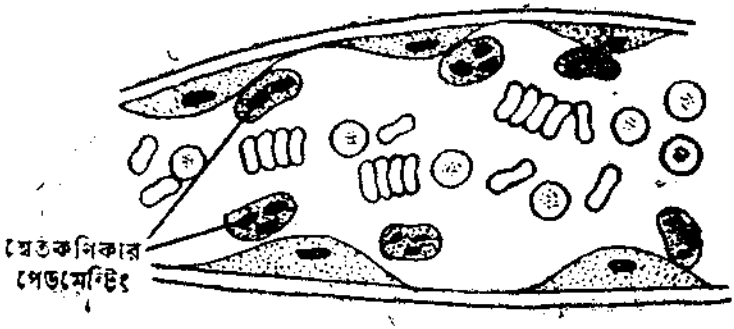

চিত্র ১২

রক্ত রঞ্জনকে ভক্ষণ করে। আক্রমণাত্মক ব্যাকটেরিয়াদের ভক্ষণের জন্য অপসোনিন নামক পদার্থের প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু কখনও কখনও উপযুক্ত মাধ্যম যেমন ফিবরিন, থাকলে অপসোনিন ছাড়াই কোষভক্ষণ সম্ভবপর হয়। একে সারভেস কোষভক্ষণ বলে।

শ্বেতকনিকা দ্বারা ভক্ষিত হবার পর, লাইসোজোম লেকটোফেরিন বিজারক দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। শ্বেতকণিকা সোজাসুজি এক রেখা ধরে ব্যাকটেরিয়ার

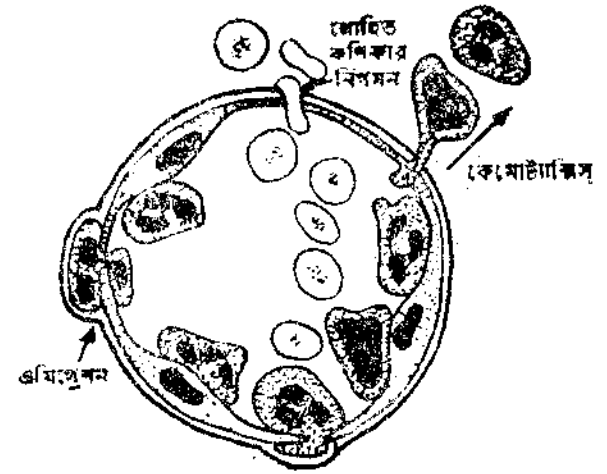

চিত্র ১৩

দিকে ধাবিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে কমোট্যাক্সিস বলে। এই বৈশিষ্ট্যের ফলেই শ্বেতকণিকা রক্তনালী হতে বাইরে বের হয় এবং জীবাণুর দিকে আকৃষ্ট হয়।

বহুবিধ পদার্থের কেমোট্যাকসিসসুলভ ক্ষমতা আছে। যেমন শর্করা, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি। এন্টিজেন-এন্টিবডি মিশ্রিও এ ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু তখনই যখন কমপ্লিমেন্টকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলা হয়। যে সমস্ত কমপ্লিমেন্ট এ ব্যাপারে ভূমিকা পালন করে তারা হলো—সি৩, সি৫, সি৫ : ৬৭।

কেমোট্যাকসিসের ক্ষমতাসম্পন্ন বস্তুসমূহ লক্ষ্যসমূহকে সঠিকভাবে চিনে নিতে সক্ষম। প্রদাহ ক্ষরণের লিউকোট্রিঅন নামক এক প্রকার বিজারক বিদ্যমান যারা কেমোট্যাকসিসসুলভ ক্ষমতার অধিকারী।

বিভিন্ন শ্রেণীর শ্বেতকণিকার কেমোট্যাকসিস ক্ষমতার তীব্রতার তারতম্য থাকে। এ বিষয়ে নিউট্রোফিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও লিমফোসাইট সর্বাপেক্ষা দুর্বল।

কোন কোন বস্তু আকর্ষণের পরিবর্তে শ্বেতকণিকাকে বিকর্ষণ করে থাকে। এদের নেতিবাচক কেমোট্যাকটিক এজেন্ট বলে।

প্লাজমা হতে নিসৃত ফিবরিনোজেনের উপর ধ্বংসপ্রাপ্ত শ্বেতকণিকা হতে বের হওয়া থ্রমবিনের বিক্রিয়ার ফলে ফিবরিন সৃষ্টি হয়। এরা সুতার আকারে বিরাজ করে এবং প্রদাহ বিস্তারে বাধা সৃষ্টি করে। এছাড়া ফিবরিন জীবাণুর প্রদাহ ক্ষরণে সাঁতরে চলে জীবাণুকে ঘিরে ফেলার জন্য বাহন হিসাবে ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে কোষ ভক্ষণের জন্য অপসোনিনের প্রয়োজন হয় না।

২। ক্ষরণজনিত পরিবর্তন

রক্তপ্রবাহ ও কোষজনিত পরিবর্তনের ফলে প্রদাহ স্থানে আমিষ বা প্রোটিন-সমৃদ্ধ তরল পদার্থ জমা হয়। এর আপেক্ষিক গুরুত্ব ১·০০৪-এর উপর। ক্ষরণের উৎস হলো : (ক) রক্ত, (খ) কলারস। এ নিম্নলিখিত উপাদান দ্বারা গঠিত :

(ক) কোষ :

(i) রক্ত হতে উদ্ভূত যেমন—নিউট্রোফিল, লিমফোসাইট, মনোসাইট ইত্যাদি।

(ii) প্রদাহ হতে উদ্ভূত—ম্যাকরোফেজ।

(খ) তরল উপাদান : সেরাম, রক্ত ও অন্তকলা রস হতে উদ্ভূত। রক্তের সাথে অপসোনিন, কমপ্লিমেন্ট, ইমিওনোগ্লোবিউলিন ও জীবাণুনাশক ঔষধ বিদ্যমান থাকে।

প্রদাহ কোষসমূহের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ নিচে বর্ণনা করা হলো :

নিউট্রোফিল : এরা প্রদাহের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রথম সারির ব্যূহ সৃষ্টি করে। বিশেষ করে তাৎক্ষণিক ও পূঁজ-সৃষ্টিকারী প্রদাহে। প্রদাহস্থানে

পৌঁছাতে তাদের মাত্র তিন হতে চার মিনিট সময় লাগে।

এরা আক্রমণকারী ব্যাকটেরিয়াকে গ্রাস করে, ভক্ষণ করে ও হজম করে ফেলে। এরা ক্ষরণজাত তরলে সাঁতরাতে পারে না। এবং ফিবরিনের মাধ্যমে গুটিসুটি হয়ে চলাফেরা করে।

এরা আমিষ বিনষ্টকারী বিজারক নিঃসরণ করে বা মরেকলাকে গালিয়ে দিয়ে আরোগ্য লাভে সহায়তা করে।

ইসনোফিল : এরা প্রদাহে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, বিশেষ করে পরজীবি প্রসূত, এলার্জি প্রসূত ও যে সমস্ত অবস্থায় ইমিউনোগ্লোবিউলিন-ই অধিক মাত্রায় পাওয়া যায় যে সমস্ত প্রদাহে এদের ভূমিকা সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। কিন্তু ধারণা করা হয় যে, এরা হিস্টামিন ও অন্যান্য রাসায়নিক মাধ্যম যেমন—স্লো একটিভ সাবসট্যান্স অব এনাফাইল্যাকসিসকে কিছু পরিবর্তন করে যার ফলে তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এদের কোষ ভক্ষণ ক্ষমতা ও কেমোট্যাকসিসের ক্ষমতা আছে কিন্তু পরিমিত।

লিমফোসাইট : দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ কোষের মধ্যে লিমফোসাইট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরা ইমিউনিটি বা আত্মরক্ষার প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। এদের কার্যক্ষমতা নিম্নরূপ :

(১) **সেল মেডিয়েটেড ইমিউনিটি :** এরা সেল-মেডিয়েটেড ইমিউনিটিতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে। টি–লিমফোসাইট জাতীয় লিমফোসাইট এর জন্য দায়ী।

(২) **বিলম্বিত ইমিউনিটি বা হাইপারসেনসিটিভিটি :** টি-লিমফোসাইট বিলম্বিত হাইপারসেনসিটিভ জাতীয় ইমিউনিটির ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

(৩) **দেহরসজাত (humoral) ইমিউনিটি :** লিমফোসাইট এনটিবডি উৎপন্ন করে এবং এদের বাহক হিসাবে কাজ করে বলে মনে করা হয়।

(৪) টিউমার কোষ দূর করে,

(৫) গ্রাফটকে দূর করে,

(৬) ইমিউনিটিতে প্রহরীর কাজ (suriveillence) করে।

প্লাজমা কোষ : দীর্ঘকাল স্থায়ী দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ বিশেষ করে যাদের সাথে ইমিউনিটির সম্বন্ধ আছে তাদের ক্ষেত্রে প্লাজমা কোষ উপস্থিত থাকে। সিফিলিস, রিউমেটয়েড আরথ্রাইটিস, হাইপারসেনসিটিভিটি রিয়াকশন, হাম, রুবেলা, জল-বসন্ত এ সমস্ত প্রদাহের উপমা।

এরা ছোট লিমফোসাইট হতে উৎপন্ন হয়। ইমিউনোগ্লোবিউলিন উৎপাদনের এক উল্লেখযোগ্য সূত্র।

মাস্ট-কোষ : এদের কেন্দ্রকের একদিকে একটু খাঁজ কাটা এবং সাইটোপ্লাজমে দানা বিদ্যমান থাকে। তাৎক্ষণিক প্রদাহে এরা কোষভক্ষক হিসাবে অংশ নেয়। এদের বিবিধ প্রকার রাসায়নিক বিক্রিয়া আছে। এরা সেরোটোনিন, হেপারিন ও হিস্টামিন তৈরী করে।

ম্যাকরোফেজ : এ প্রকার কোষ নিম্নলিখিত সূত্র হতে উৎপন্ন হয়।

(১) রক্ত ক্যাপিলারীর দেওয়ালের কোষ হতে—যেমন কুফারের কোষ।
(২) কোষ অন্তর্গত হিসটিওসাইট।
(৩) মনোফেজ—এরা প্রদাহ স্থানে ম্যাকরোফেজে রূপান্তরিত হয়।

অনেকে ধারণা করেন লিমফোসাইটও প্রদাহ স্থানে ম্যাকরোফেজে রূপান্তরিত হতে পারে। এরা তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহের শেষ পর্যায়ে উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এরা ঝাড়ুদারের ভূমিকা পালন করে ও মৃত কোষ, পুঁজ-কোষ, ও ব্যাকটেরিয়াদের ভক্ষণ করে প্রদাহ স্থান হতে অপসারণ করে। নিউট্রোফিল প্রদাহ স্থানে পৌঁছানোর পূর্বে ব্যাকটেরিয়াদের গ্রাস করে।

ইমিউনিটির ক্ষেত্রেও এদের ভূমিকা আছে। এরা এনটিজেনকে গ্রাস করে লিমফোসাইটে পৌঁছে দেয় যা থেকে লিমফোসাইট এনটিবডি তৈরী করে। সেল জাত ইমিউনিটিতে এরা অংশ গ্রহণ করে। কোন কোন সেল মেডিয়েটেড ইমিউনিটিতে এরা affector কোষ হিসাবে কাজ করে। এদের দেহের উপরতলে ইমিউনোগ্লোবিউলিন ও কমপ্লিমেন্টদের গ্রহণ করার জন্য কেন্দ্রবিন্দু বিদ্যমান থাকে।

দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহে দুটো পরিবর্তন লক্ষণীয় :

(ক) এরা বড় ও লম্বা আকার ধারণ করে। যার ফলে তাদের এপিথেলিয়াম কোষের মত দেখায়। এদের এপিথেলয়েড কোষ বলা হয়।
(খ) এরা কয়েকটি একসাথে মিশে যায় ও giant cell বা দৈত্য-কোষ সৃষ্টি করে।

দৈত্য কোষ : সাধারণ কোষের চেয়ে বড় যাদের একটির বেশী কেন্দ্রক থাকে তাদেরকে দৈত্য-কোষ বা giant cell বলে।

এরা তিন প্রকারের হয়ে থাকে : (১) ফরেন বডি দৈত্য কোষ, (২) টিউমার দৈত্য কোষ, (৩) বিবিধ দৈত্য কোষ।

ফরেন বডি দৈত্য কোষ ঃ এদের উৎপত্তি ম্যাকরোফেজ হতে। যখন এপিথেলয়েড কোষসমূহ একাকী কোন অসংগত বস্তুকে সরাতে অসমর্থ হয় তখন কয়েকটি এপিথেলয়েড এক হয়ে মিলেমিশে দৈত্য কোষ হিসাবে সে কাজ সম্পন্ন করে। এছাড়া, মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকিউলোসিসের দেহের লিপিড উপাদান বিচ্ছুরিত হওয়ার ফলে এদের সৃষ্টি হতে পারে।

এদের নিম্নলিখিত অবস্থাতে পাওয়া যায় ঃ

(১) বিবিধ দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ যেমন, যক্ষা, কুষ্ঠ রোগ, ছত্রক রোগ।
(২) পুরাণ রক্তপাতের স্থান।
(৩) অসংগত বস্তু যেমন ট্যালকম, কোলেসটেরোল ফ্যাট নেকরোসিস, জানথোমা ইত্যাদি।

চিত্র ১৪

অবয়ব ঃ এরা স্বাভাবিক কোষের চেয়ে বড়, ও বহু কেন্দ্রকসম্পন্ন। কেন্দ্রকের সংখ্যা পঞ্চাশ হতে একশত হতে পারে। কেন্দ্রকসমূহ ছোট কিন্তু আকৃতিতে সমান। এরা সাইটোপ্লাজমে বিস্তীর্ণভাবে ছড়িয়ে থাকে অথবা এক মাথায় অথবা দু'মাথায় অথবা ঘোড়ার খুরের আকারে কিনারে বিরাজ করে। যখন এরা কিনারাতে বিরাজ করে এবং মধ্যবর্তী অংশের সাইটোপ্লাজম সমসত্ত্ব ও লালচে হয় তখন তাদের ল্যাংগহান কোষ বলে আখ্যায়িত করা হয়।

টিউমার দৈত্য কোষ ঃ এই জাতীয় দৈত্য কোষ টিউমারের ক্ষেত্রে কোষ হতে উৎপন্ন হয়। টিউমারের ক্ষেত্রে কোষের কেন্দ্রক দ্রুততর গতিতে বিভাজিত হয়, পক্ষান্তরে প্রোটোপ্লাজমের বিভাজন দেরীতে ঘটে। ফলে কোষসমূহে একের অধিক কেন্দ্রক উপস্থিত থাকে ও দৈত্যকোষ সৃষ্টি করে। এরা আকারে বড় এবং একাধিক কেন্দ্রক সম্পন্ন। কেন্দ্রকের সংখ্যা ফরেন বডি দৈত্য কোষের ন্যায় অত সংখ্যক বিদ্যমান থাকে না। কেন্দ্রক অস্বাভাবিক ও ক্রোমাটিনের পরিমান প্রচুর। এদের নিম্নলিখিত অবস্থায় পাওয়া যায় ঃ

১) অস্টিওজেনিক সারকোমা,
২) রাবডোমায়ো সারকোমা,
৩) গ্লাইকো ব্লাসটোমা,
৪) লিভার সেল কারসিনোমা,
৫) অস্টিওক্লাসটোমা,
৬) কোরিওএপিথেলিওমা,
৭) রিড স্টার্নবার্গ কোষ।

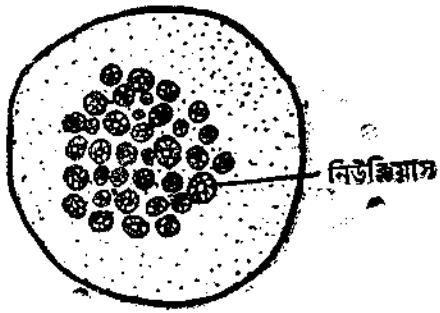

চিত্র ১৫

বিবিধ দৈত্য কোষ ঃ কোন কোন দৈত্য কোষকে উপরোল্লিখিত কোন শ্রেণীতে অন্তর্ভূক্ত করা যায় না। তাদের বিবিধ দৈত্যকোষ হিসাবে স্বতন্ত্র এক শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

অনেক পরিস্থিতিতে মেসোডার্ম কোষ ক্রমাগত উত্তেজনার ফলে বৃহৎ আকার ধারণ করে ও দৈত্য কোষে পরিণত হয়। **উদাহরণ ঃ**

(ক) আসফের কোষ—রিউম্যাটিক ফিভারে পাওয়া যায়; (খ) এপিথেলিয়াম দৈত্য কোষ,—হারপিসে পাওয়া যায়; (গ) ওয়ারদিম-ফিনকেলাডি কোষ-হামে পাওয়া যায় ইত্যাদি।

ফরেন বডি ও টিউমার জাতীয় দৈত্য কোষের তফাৎ

ফরেন বডি দৈত্য কোষ	টিউমার দৈত্য কোষ
১। ছোট	১। বড়
২। কেন্দ্রক সংখ্যায় বেশী	২। কম
৩। কেন্দ্রক ছোট ও সমান	৩। বড় ও অসমান
৪। কেন্দ্রক কিনারায় বা মধ্যস্থলে অবস্থিত	৪। মধ্যস্থলে অবস্থিত
৫। কয়েকটি মিলিত হয়ে অথবা লিপিড ছড়িয়ে পড়ে গঠিত হয়	৫। সাইটোপ্লাজম অপেক্ষা কেন্দ্রক দ্রুতগতিতে বিভক্ত হওয়ায় সৃষ্টি হয়
৬। প্রদাহে পাওয়া যায়	৬। টিউমারে পাওয়া যায়।

তরল প্রকৃতির প্রদাহ সৃষ্টির কারণ

তরলিত প্রদাহ সৃষ্টির কারণ বর্ণিত হলো ঃ

(১) **রক্তনালী দিয়ে আমিষের বেশী মাত্রায় নিষ্ক্রমণ**—রক্তনালীর দেওয়ালের দুকোষের মধ্যবর্তী ফাঁক ও কোষের মধ্যস্থ ছিদ্রপথের মধ্য দিয়ে আমিষ নির্গত হয়।
হিস্টামিন উপরোল্লিখিত ছিদ্রসমূহ বৃদ্ধি করার ফলে অধিক মাত্রায় নির্গত হয়।

(২) **রক্তনালীতে রক্তের চাপ বৃদ্ধির ফলে**—প্রদাহে রক্তনালীতে রক্তচাপ বৃদ্ধি অসমোটিক চাপের চেয়ে বেশী থাকে। এর ফলে তরল রক্তনালীর বাইরে বেরিয়ে পড়ে।

(৩) **আমিষের বৃহৎ মোলেকিউলের লঘুকরণ**—প্রদাহের ফলে আমিষের বৃহৎ অণু ভেঙ্গে ছোট হয় যার ফলে অন্তবর্তী কলায় রসের অসমোটিক চাপ বৃদ্ধি পায় যার ফলে পানি জমে।

৩। কলাজনিত পরিবর্তন

আক্রান্ত কলায় স্থানীয়ভাবে দু'প্রকার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় ঃ
(ক) অবক্ষয়জনিত, (খ) কলা বৃদ্ধি।

(ক) অবক্ষয়জনিত পরিবর্তন ঃ যখন প্রদাহ সৃষ্টিকারী উত্তেজক তীব্র হয় তখন কলাতে অবক্ষয় সৃষ্টি হয়। যখন উত্তেজক মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী তখন কলায় সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। অন্তর্বিষ ও ব্যাকটেরিয়া হতে উদ্ভূত আমিষনাশী উৎসেচক দ্বারা অবক্ষয় সংঘটিত হয়। এক্ষেত্রে অবক্ষয় ফ্যাটিচেঞ্জ ও ক্লাউডি সোয়েলিং জাতীয়। যদি এ প্রক্রিয়া বহুদিন চলে তবে কোষ-পচিতি দেখা দেয়। পচা কোষসমূহ ও ব্যাকটেরিয়া উৎসেচক দ্বারা তরলায়িত হয়ে পুঁজের জন্ম দেয়।

স্পষ্ট লক্ষণাদি

(১) **রং** —প্রদাহ স্থান রক্তাধিক্যতার ফলে লাল হয়।
(২) **ফোলা** —এনডোথেলিয়াম, ফাইব্রোব্লাস্ট কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি ও ক্ষরণ জমা হওয়ার ফলে স্থানটি ফুলে উঠে।
(৩) **তাপ** —রক্তাধিক্যতার ফলে উক্তস্থান গরম হয়।
(৪) **ব্যথা** —ক্ষরণ জমা হওয়ার ফলে স্নায়ুতে টান পড়ায় ব্যথা অনুভূত হয়।

শ্রেণী বিভাগ

নিম্নলিখিত নিয়ামকের ভিত্তিতে প্রদাহকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

(১) কত দিন হতে চলছে; (২) ক্ষরণের প্রকৃতি কেমন; (৩) কোন্ স্থান আক্রান্ত।

(১) কত দিন হতে প্রদাহ চলছে তার উপর ভিত্তি করে এদের নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ

(ক) **তাৎক্ষণিক প্রদাহ**—এ ক্ষেত্রে প্রদাহ হঠাৎ শুরু হয়, অল্পকাল স্থায়ী হয় ও নিরাময় হঠাৎ ও সম্পূর্ণ। রক্তাধিক্যতা ও ক্ষরণ সৃষ্টি এর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। নিউট্রোফিল এ জাতীয় প্রদাহের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কোষ।

ক্ষরণের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক প্রদাহকে আরও উপশ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় বা 'ক্ষরণ' অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

(খ) **দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ**—এক্ষেত্রে প্রদাহ শুরু হয় ধীরে ধীরে অস্পষ্টভাবে, বহুদিন ধরে চলে এবং আস্তে আস্তে নিরাময় হয়। প্রদাহ সৃষ্টিকারী কারণের কম শক্তিশালী হওয়া অথবা দীর্ঘদিনব্যাপী উপস্থিত থাকাই দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহের কারণ। গোড়া থেকেই দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ হিসাবে শুরু হতে পারে অথবা তাৎক্ষণিক প্রদাহ রূপান্তরিত হয়ে এর সৃষ্টি হতে পারে। এ বহু প্রকার হতে পারে। এরা নির্দিষ্ট জীবাণু দ্বারা যেমন যক্ষা, কুষ্ঠ, সিফিলিস অথবা অনির্দিষ্ট জীবাণু যেমন ই-কোলাই দ্বারা সৃষ্টি হতে পারে। অনড় কোন বস্তু এর জন্য দায়ী হতে পারে। যেমন ট্যালকাম পাউডার, অসংগত বস্তু আঘাত ইত্যাদি। ক্ষরণ সৃষ্টির চেয়ে কোষ বৃদ্ধি অধিকতর লক্ষণীয়।

ফাইব্রোব্লাস্টের বৃদ্ধিই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যার ফলে প্রদাহ স্থানে Scar সৃষ্টি হয়।

প্লাজমা কোষ এককেন্দ্রিক কোষ ও ম্যাকরোফেজ হলো এ জাতীয় প্রদাহের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কোষ। যদিও নিউট্রোফিলও পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে গ্রানুলোমা সুলভ এবং অগ্রানুলোমা সুলভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। রক্তে এনটিবডির মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

(গ) সব এক্যুইট বা আধা তাৎক্ষণিক প্রদাহ।

(২) প্রদাহের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রদাহ দ্বারা সৃষ্ট ক্ষরণের প্রকৃতি বিভিন্ন। তার উপরে ভিত্তি করে প্রদাহকে নিম্নলিখিত উপশ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে ঃ

(ক) **ক্যাটারহাল**—এ ক্ষেত্রে ক্ষরণের মূল উপাদান হলো মিউসিন।

মিউকাস গ্রন্থিসম্পন্ন ঝিল্লীস্তরের প্রদাহে, পাওয়া যায়। যেমন ফুসফুস, অন্ত্র, মূত্রনালীর প্রদাহে।

(খ) সেরাস—এর বৈশিষ্ট্য হলো এতে প্রচুর পরিমাণে পানি সাদৃশ্য ক্ষরণ সৃষ্টি হয় যার আমিষ উপাদান খুব অল্প। রক্ত, সেরাম অথবা মেসোথেলিয়াম গ্রন্থির ক্ষরণ এর মূল উৎস। উদাহরণ—প্লুরিসি, চর্মের জলকোষ ইত্যাদি।

(গ) ফিবরিনাস—এ ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে ফিবরিনোজেন ক্ষরিত হয় যা ফিবরিনতন্তু হিসাবে তলানি পড়ে। পেরিকারডাইটিস, আরথাইটিস ইত্যাদি এর উদাহরণ।

(ঘ) মেমব্রেনাস—এ জাতীয় প্রদাহে ক্ষরিত বস্তু ফিবরিনের এক স্তর দ্বারা প্রদাহ স্থানে আটকে থাকে। যেমন ডিপথেরিয়ার পর্দা।

(ঙ) পুরুলেন্ট অথবা সাপুরেটিভ অথবা পুঁজক প্রদাহ—এ জাতীয় প্রদাহে প্রদাহ স্থানে নির্ভেজাল পুঁজ সৃষ্টি হয়।

পুঁজ—পুঁজ বলতে প্রদাহের ফলে সৃষ্ট হলুদ রংয়ের আধা তরল অথবা তরল পদার্থকে বুঝায়। মৃত কোষ ও জীবাণু দ্বারা এ গঠিত যা লিউকোসাইট হতে নিঃসৃত উৎসেচক দ্বারা তরলায়িত হয়। পুঁজ উৎপাদনের জন্য তিনটি জিনিসের প্রয়োজন ঃ (১) কোষ-পচিতি (২) শ্বেত কণিকার উপস্থিতি; (৩) আমিষবিনাশী উৎসেচক।

কোন কোন ব্যাকটেরিয়া পুঁজ উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। এদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলো ঃ

স্ট্যাফাইলোকক্কাস, স্ট্রেপটোকক্কাস, নিউমোকক্কাস, প্রোটিয়াস, মেনিনগোকক্কাস, সিউডোমোনাস, গনোকক্কাস, ই. কোলাই।

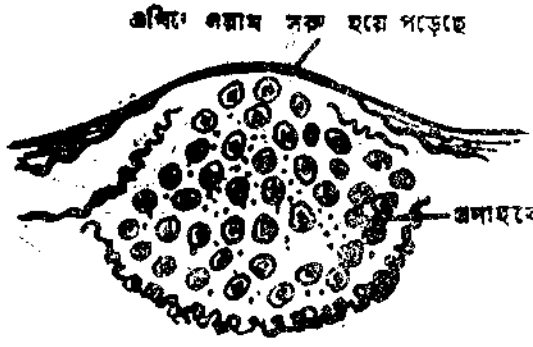

চিত্র১৬

কোন কোন রাসায়নিক পদার্থও পুঁজ সৃষ্টিকারক। কুইনিন, আয়রন ইত্যাদি এদের মধ্যে অন্যতম।

পুঁজক প্রদাহের উল্লেখযোগ্য কয়েকটির বিবরণ নিচে দেওয়া হলো ঃ

(অ) পুঁজাক্তি (Abscess) : স্থানীয়ভাবে পুঁজ সঞ্চারণকে পুঁজাক্তি বলে। এ পুঁজাক্তির প্রাচীর সাধারণতঃ জীবন্ত কিন্তু ভাঙ্গা ভাঙ্গা কলা দ্বারা গঠিত। এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণ প্রদাহ কোষ বিদ্যমান থাকে। নিয়তই পুঁজ জমা হয়। ফলে কলার যেদিকে প্রতিরোধ কম পুঁজাক্তি সেদিকে প্রসারিত হতে থাকে।

(আ) ফোড়া (Boil) : লোমকূপ অথবা সেবেসিয়াস গ্রন্থির প্রদাহের ফলে সৃষ্ট পুঁজাক্তিকে ফোড়া বলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্ট্যাফাইলোকক্কাস দ্বারা এর সৃষ্টি। পাছা, ঘাড়ের পেছন, বগল ইত্যাদি স্থানেই বেশী হারে আক্রান্ত হয়।

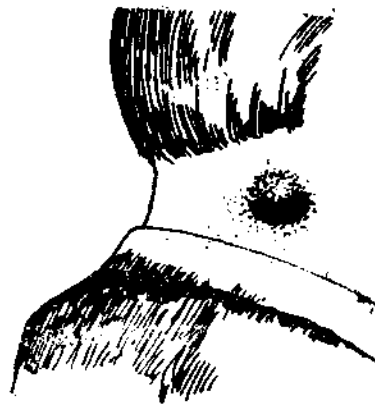

চিত্র ১৭

(ই) কারব্যাংকল : এ কয়েকটি ফোড়ার সমষ্টি যেখানে প্রদাহ চামড়ার অধীনস্থ কলায় ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। এতে কলায় ব্যাপক কোষ-পচিতি ঘটে। বেশ কয়েকটি মুখ থাকে যার মধ্যদিয়ে পুজ বাইরে বের হয়।

বহুমূত্র রোগীরা এতে বেশী আক্রান্ত হয়। অন্তর্বিষ সৃষ্টি হওয়ায় রোগীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় রূপ ধারণ করে। পৃষ্ঠ ও ঘাড়ের পিছন সাধারণতঃ এর আক্রান্তস্থল।

(ঈ) সেলুলাইটিস : উপত্বকের পুঁজ সৃষ্টিকারী প্রদাহের নাম সেলুলাইটিস। স্ট্রেপটোকক্কাসই এর জন্য দায়ী। এরা স্টেপ্টোকাইনেজ ও হায়েলুরোনিডেজ সৃষ্টি করে যা ফিবরিনকে ধবংস করার ফলে প্রদাহ বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে না, ফলে বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে থাকে।

(উ) এরিসেপেলাস : এ চামড়ার এক প্রকার প্রদাহ যা দ্রুত বিস্তার লাভ করে। আক্রান্ত স্থান লালচে দেখায়।

(ঙ) ক্ষত : প্রদাহের ফলে উদ্ভূত পচা কলা খসে পড়ার ফলে চামড়ায় অথবা মিউকাস ঝিল্লীর অভেদ্যতা নষ্ট হয়। একে ক্ষত বা **ulcer** বলে।

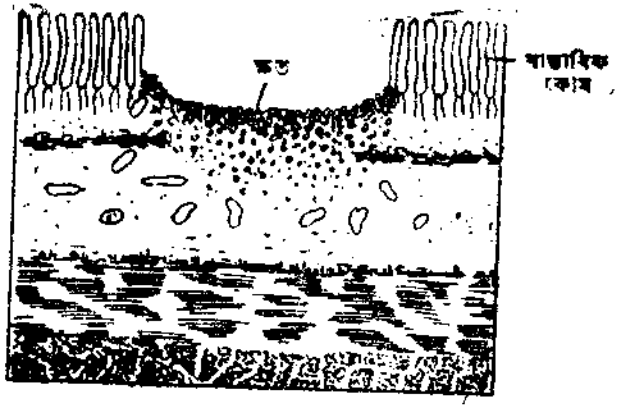

চিত্র ১৮

(ঋ) সাইনাস : সাইনাস হলো গ্রানুলেশন-সুলভ কলা দ্বারা আচ্ছাদিত নালী যার মধ্য দিয়ে পুঁজাক্তির ক্ষরণ চামড়া অথবা মিউকাস ঝিল্লী স্তরের বাইরে নির্গত হয়।

(এ) ফিসটুলা : সাইনাসের মত ফিসটুলা হলোএমন এক নালী যা গ্রানুলেশন কলা দ্বারা আচ্ছাদিত এবং যার দুইমুখইখোলা। এর মধ্য দিয়ে পুঁজাক্তির পুঁজ চামড়া এবং মিউকাস ঝিল্লীস্তর দিয়ে অথবা দুই ফাঁপা অঙ্গের ঝিল্লীস্তর দিয়ে বের হয়। যেমন এনো-রেকটাল ফিসটুলা, এনটেরো-কলিক ফিসটুলা।

প্রদাহ স্থানের ভিত্তিতে প্রদাহ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। দেহের যে কোন অংশে প্রদাহ সৃষ্টি হতে পারে। ইংরেজীতে, আক্রান্ত কলা বা অঙ্গের নামের সাথে **itis** যোগ করে সেই প্রদাহকে নির্দেশ করা হয়। যেমন, কনজানটিভার প্রদাহে কনজানটিভাইটিস।

পরিণাম (Sequle) : তাৎক্ষণিক প্রদাহের নিম্নলিখিত পরিণাম ঘটতে পারে :

(ক) সম্পূর্ণ নিরোগ লাভ (resolution) : তীব্র ও তাৎক্ষণিক প্রদাহ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রদাহের কোন চিহ্ন আর থাকে না। প্রদাহজনিত মৃত কোষসমূহ ম্যাকরোফেজ দ্বারা অপসারিত হয়।

(খ) অর্গানাইজেশন **(Organisation) :** প্রদাহ স্থানে কোষ-পচিতির জন্য যে ফাঁকের সৃষ্টি হয় তা তন্তুপ্রাচুর্য দ্বারা পূরণ হয়। একে অর্গানোইজেশন বলে। তন্তুপ্রাচুর্যের মাত্রা অত্যধিক হতে পারে। এর ফলে নিম্নলিখিত জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে :

(১) অঙ্গের বিকৃতি ঘটতে পারে,
(২) ফাঁপা অঙ্গের পথ সংকীর্ণ হতে পারে,
(৩) সুতার মত গুটলে সৃষ্টি হওয়ায় বিভিন্ন জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে,
(৪) পুঁজাক্তি, ফিসটুলা, সাইনাস ইত্যাদি গঠিত হতে পারে,
(৫) পায়েমিয়া ও সেপ্টিসেমিয়া দেখা দিতে পারে,
(৬) প্রদাহ দীর্ঘস্থায়ীতে রূপান্তরিত হতে পারে।

প্রদাহের রাসায়নিক মাধ্যম (Chemical Mediator)

রক্ত অথবা কলারসের মধ্যে বিদ্যমান বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য প্রদাহের বিভিন্ন প্রক্রিয়াতে অংশ গ্রহণ করতে পারে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির বিবরণ দেওয়া হল :

(১) এমাইন

হিস্টামিন : এ বেসোফিল, মাস্ট কোষ ও অণুচক্রিকা হতে নিঃসৃত হয়। এরা রক্তনালীকে স্ফীত করে ও তাদের দেওয়ালের ভেদ্যতা বৃদ্ধি করে।

লিউয়ের তিন প্রতিক্রিয়ার (**Triple response of Lewis**) জন্য হিস্টামিনকে দায়ী করা হয়। এই তিন প্রতিক্রিয়া হলো :

(১) লাল রেখা সৃষ্টি হওয়া; (২) রক্তাভ রং ধারণ করা; (৩) চক্রাকারে স্ফীত হওয়া।

বেসোফিল কোষের ক্ষেত্রে এ কেমোট্যাকসিসের কাজও করে।

সেরোটোনিন (RHT-5 Hydroxy Tryptamine)—সেরোটোনিন মাস্ট কোষ ও অণুচক্রিকা হতে নিঃসৃত হয় এবং হিস্টামিনের মত রক্তনালীর স্ফীতিকরণ ও ভেদ্যতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

(২) প্লাজমা প্রোটিয়েজ

এদের মধ্যে অন্যতম হলো :—

(ক) কিনিন—এদের মধ্যে ব্রাডিকিনিন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এরা পলিপেপটাইড শ্রেণীভুক্ত ক্যালিক্রেইন নামক বিজারকের সাহায্যে কিনিনোজেন নামক বস্তু হতে প্রস্তুত হয়। এরা রক্তনালীকে স্ফীত করার শক্তি রাখে। রক্তনালীর ভেদ্যতা বৃদ্ধি করে ও মসৃণ মাংসপেশীকে সংকুচিত করে।

(খ) কমপ্লিমেন্ট সিসটেম—কমপ্লিমেন্ট সিসটেমের কিছু কিছু উপাদান প্রদাহ-প্রক্রিয়াতে গরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কমপ্লিমেন্ট-তিন ও কমপ্লিমেন্ট-পাঁচ সক্রিয় হয়ে উঠে। যার ফলে রক্তনালী স্ফীত হয় ও তাদের দেওয়ালের ভেদ্যতা বৃদ্ধি পায়।

কমপ্লিমেন্ট—পাঁচ নিউট্রোফিলের ক্ষেত্রে কেমোট্যাকটিক হিসাবে কাজ করে।

কমপ্লিমেণ্ট-তিন ব্যাকটেরিয়াদের সংস্পর্শে এলে অপসোনিন হিসাবে কাজ করে যার ফলে কোষ ভক্ষণে সুবিধে হয়।

(গ) **কিনিন প্রস্তুতকারক বিজারকসমূহ**—কালিক্রেনিন অথবা প্লাজমিন। এরা প্লাজমা প্রোটিনের স্বাভাবিক উপাদান। এরা রক্তনালীর দেওয়ালের ভেদ্যতা বৃদ্ধি করে এবং কমপ্লিমেণ্ট-তিনকে সক্রিয় করে কমপ্লিমেণ্ট-তিন-এ এবং ফ্যাক্টর-এ কে সক্রিয় করে ফ্যাকটর-এফ-তে পরিণত করে। লিউকোসাইটের ক্ষেত্রে এরা কেমোট্যাকটিক হিসাবে কাজ করে।

(ঘ) **পোস্টাগ্লানডিন**—শুক্র ও অন্যান্য দেহরসে পোস্টাগ্ল্যানডিন নামে এক পদার্থ বিদ্যমান যাদের প্রদাহের বিভিন্ন পর্যায়ে গরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পুর্ণঃবিন্যাস করে যার ফলে রক্তনালীর ভেদ্যতা বৃদ্ধি পায়; রক্তনালী স্ফীত হয় এবং কেমোট্যাকটিক হিসাবে কাজ করে।

(ঙ) **শ্বেত কণিকাজাত বস্তু**—যেমন লিউকোট্রিক্সিন রক্তনালীর ভেদ্যতা বৃদ্ধি করে।

(চ) **স্লো রিয়াকটিং সাবসট্যান্স**—যা মাস্টকোষ দ্বারা নিসৃত হয়।

(ছ) **ইসনোফিল**—কেমোট্যাকটিক ফ্যাকটর ফর এনাফাইল্যাকসিস—এও মাস্ট কোষ দ্বারা নিসৃত হয়।

(জ) **ক্লটিংসিসটেম**—কলা বিনষ্টির ফলে হেগমেন ফ্যাক্টর (ফ্যাক্টর—৭) সক্রিয় হয় ও প্রদাহের বিভিন্ন পর্যায়ে অংশ গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে তারা কিনিন ও কমপ্লিমেণ্ট সিসটেমের সাথে যোগসাজসে কাজ করে।

দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ

সংজ্ঞা

দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ বলতে এমন প্রদাহকে বুঝায় যা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়, যেখানে ক্ষরণ প্রক্রিয়া ও প্রদাহজনিত পচা কোষ অপসারণ প্রক্রিয়া এবং ক্ষত-পূরণ (**wound healing**) একসাথে চলে।

কারণঃ দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহের কারণ বহু ও বিবিধ। উল্লেখযোগ্য কারণসমূহকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে :

(১) অণুজীব—যেমন ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ইত্যাদি।

(২) প্রাণহীন বস্তুসমূহ—যেমন ট্যালকাম, বালি, ধুলা ইত্যাদি।

(৩) ভৌতিক প্রদার্থ—যেমন আঘাত, তাপ।

(৪) হাইপার সেনসিটিভিটি—অতি সংবেদনশীলতা।
(৫) রাসায়নিক পদার্থ— যেমন এসিড, ক্ষার, অন্তর্বিষ ইত্যাদি।
(৬) যে সমস্ত কারণে তাৎক্ষণিক প্রদাহ সহসা প্রশমিত হয় না—যেমন ক্ষরণ অপসারণে বিঘ্নতা, অসংগত বস্তুর উপস্থিতি।
(৭) তাৎক্ষণিক প্রদাহের কারণসমূহ যদি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

শ্রেণী বিভাগ

দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ নিম্ন প্রকারের হতে পারে :

(১) (ক) তীব্র প্রদাহের উত্তরসূরী হিসাবে বিদ্যমান, (খ) প্রথমথেকে এভাবে শুরু হওয়া।
(২) (ক) নির্দিষ্ট অণুজীবী দ্বারা সৃষ্ট যেমন টিউবারকিউলার, (খ) অনির্দিষ্ট অণুজীবী দ্বারা সৃষ্ট ও যেখানে নির্দিষ্ট কোন ধরনের কোষ পরিবর্তন ঘটে না।
(৩) আণুবীক্ষণিক কলা পরিবর্তনের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রদাহের ক্ষেত্রে কলা পরিবর্তনের আণুবীক্ষণিক চিত্র ভিন্ন। সেই ভিত্তিতে দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে :—

(ক) গ্রানুলোমেটাস, (খ) টিউবারকিউলার, (গ) সাপুরেটিভ।

এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহের শ্রেণীবিন্যাস করা খুব কষ্টসাধ্য। কারণ এ জটিল ও দ্ব্যর্থক।

দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহে পরিবর্তনের ধারা

এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহে ক্ষরণজনিত পরিবর্তন,

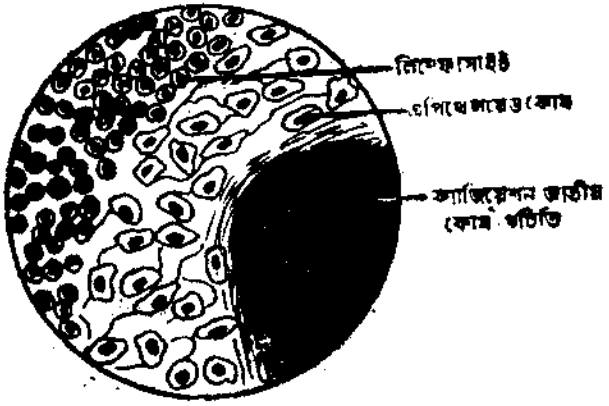

চিত্র ১৯

পচা কোষের অপসারণ ও ক্ষত পূরণের প্রক্রিয়া একসাথে চলতে থাকে। কিন্তু

ক্ষরণজনিত পরিবর্তন ও রক্ত-প্রবাহজনিত পরিবর্তন কম লক্ষণীয়। পক্ষান্তরে কোষবৃদ্ধি লক্ষণীয়ভাবে উপস্থিত থাকে। তরল ক্ষরণের মাত্রা কম যদিও অস্থি প্রদাহ, এমপায়েমা ইত্যাদি দু এক ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম চোখে পড়ে।

পক্ষান্তরে, কোষজনিত ক্ষরণ দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহে প্রকটভাবে উপস্থিত থাকে। ম্যাকরোফেজ, দৈত্য-কোষ, এপিথেলয়েড কোষ, প্লাজমা কোষ, লিমফোসাইট ইত্যাদি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এদের দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ কোষ হিসাবে গণ্য করা হয়। নিউট্রোফিলও উপস্থিত থাকতে পারে। তবে তা পাওয়া যায় সাপুরেটিভ শ্রেণীর প্রদাহে। ম্যাকরোফেজের সংখ্যা যখন অধিকহারে বিদ্যমান থাকে তখন তাকে প্রলিফারেটিভ প্রদাহ বলে। ফাইব্রোব্লাসট ই সাধারণভাবে এ ক্ষেত্রে কলা বৃদ্ধিতে অংশ গ্রহণ করে। এর ফলে প্রচুর পরিমাণে কোলাজেন সৃষ্টি হয় যা ক্ষতচিহ্নের সৃষ্টির জন্য দায়ী (scaring)। এ ছাড়া দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহে এনড আরটেরাইটিস অবলিটেরান্স বহুল পরিমাণে সংগঠিত হয়। রক্ত নালীর টিউনিকা ইনটিমা ও এনডোথেলিয়ামের নিচে প্রচুর তন্তুপ্রাচুর্য ঘটে যার ফলে রক্ত নালীর নালিকা বন্ধ হয়ে পড়ে।

অন্যান্য পরিবর্তন সমূহ হলো কোষ-পচিতি, অবক্ষয়, ও বহু কোষের পুর্নজনন। যে সমস্ত কোষ বিভাজিত হবার ক্ষমতা রাখে তারা যখন ধবংস হয় তখন তাদের পুর্নজনন ঘটে। উপরতলের এপিথেলিয়াম কোষের ক্ষেত্রে এ বেশী মাত্রায় সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন আলসারেটিভ কোলায়টিস, কোলেসিসটাইসিসে দেখা পাওয়া যায়।

গ্রানুলোমা

যে প্রদাহে কোষ প্রাচুর্যের ফলে কলা ফুলে উঠে টিউমারের রূপ ধারণ করে তাকে গ্রানুলোমা বলে। এর আণুবীক্ষণিক চিত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ম্যাকরোফেজ, এপিথেলয়েড কোষের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এরা লিমফোসাইট, প্লাজমা কোষ ও ফাইব্রোব্লাস্ট দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। বিভিন্ন দৈত্য কোষের সমাবেশ ঘটে। কোন কোন ক্ষেত্রে মধ্যভাগে কোষ-পচিতি ঘটে।

শ্রেণী বিভাগ : গ্রানুলোমাকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :

১। ইমিউনোলজিকাল—এদের বিভিন্ন প্রদাহে পাওয়া যায়। যেমন—যক্ষ্মা, কুষ্ঠ রোগ, ছত্রাক রোগ ইত্যাদি।

২। রিয়াকটিভ—কোন উত্তেজক নিয়ামকের প্রতিক্রিয়া হিসাবে এর সৃষ্টি হয়। যেমন কোলয়েড, মিনেরাল অয়েল ইত্যাদি।

৩। টক্সিক—এরা টক্সিক বা বিষাক্ত দ্রব্যের দ্বারা সংগঠিত হয়। যেমন ট্যালকাম, সার্জারীতে ব্যবহৃত সুতা।

৪। অজ্ঞাত কারণে।

উল্লেখযোগ্য গ্রানুলোমাসমূহ

টিউবারকিউলোসিস বা যক্ষ্মা

অম্লরোধী মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস দ্বারা সৃষ্ট প্রদাহকে যক্ষ্মা বলে। এরা পাঁচ শ্রেণীতে বিভুক্ত। পাঁচটি শ্রেণীর মধ্যে হিউমান ও বোভাইন শ্রেণীর মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস মানুষের ক্ষেত্রে রোগ উৎপাদন করে। অবশ্য মিউরিয়াম শ্রেণীও কখন-সখন তা করে থাকে। ইদানিং এমন কিছু অম্লরোধী মাইকোব্যাকটেরিয়াকে মানুষের ক্ষেত্রে যক্ষ্মা সৃষ্টি করতে দেখা যায় যারা অবয়ব ও অন্যান্য দৃষ্টিকোণ থেকে বোভাইন বা হিউমান শ্রেণীভুক্ত নয়। এদের এটিপিকাল বা এনোনেমাস মাইকোব্যাকটেরিয়াম বলে।

আক্রান্ত জীবাণু নিম্নলিখিত পথে দেহে প্রবেশ করে :

(১) শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে—ড্রপলেট হিসাবে, (২) খাদ্যনালীর ভেতর দিয়ে—দূষিত পানি অথবা দুধের সাথে, (৩) সরাসরি সংস্পর্শের মাধ্যমে—চামড়ার মাধ্যমে।

প্রদাহের ফলাফল—প্রদাহের ফলাফল নিম্নলিখিত নিয়ামকের উপর নির্ভরশীল :

১। বীজাণুর সংখ্যা ও সংক্রমণশীলতা;
২। প্রবেশ পথ;
৩। আক্রান্ত রোগীর দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা;
৪। কলার সেনসিটিভিটি অথবা অতি সংবেদনশীলতা।

উপরোক্ত নিয়ামকসমূহের ভিত্তিতে প্রবাহের ধারা ও প্রকৃতি নিম্নরূপ হতে পারে : (ক) কলা-বৃদ্ধিসুলভ বা প্রলিফারিটিভ; (খ) ক্ষরণজাত।

(ক) প্রলিফারিটিভ—এ শ্রেণীর যক্ষ্মা সাধারণ এবং এর বৈশিষ্ট্য হলো প্রচুর তন্তুপ্রাচুর্য। কোন তরল ক্ষরণ দেখা যায় না।

(খ) এক্সুডেটিভ বা ক্ষরণজাত—তীব্র প্রদাহজনিত পরিবর্তন, প্রচুর তরলায়িত ক্ষরণ, নিউট্রোফিল, মনোসাইট, লিমফোসাইট-এর সমাগম এ শ্রেণীরযক্ষ্মার বৈশিষ্ট্য। এপিথেলয়েড ও দৈত্য কোষের সংখ্যা কম থাকে। সেরাস ক্যাভিটি ও এপিথেলিয়ামের প্রদাহে এই শ্রেণীর প্রদাহ বেশী পাওয়া যায়।

কলার প্রতিক্রিয়া যক্ষ্মার প্রদাহ কখন শুরু হয়েছে তার উপর নির্ভর করে। সেই ভিত্তিতে প্রদাহ দু'প্রকার হতে পারে :

(১) প্রাথমিক—যখন যক্ষ্মা প্রদাহ দেহে সর্বপ্রথম সংগঠিত হয়, তখন তাকে প্রাথমিক প্রদাহ বলে।

(২) গৌণ—প্রথম প্রদাহের পরে কোন এক সময় সংগঠিত প্রদাহকে গৌণ প্রদাহ বলে।

পর্যায় ক্রমে কলায় যে পরিবর্তন সাধিত হয় তা প্রাথমিক প্রদাহ হতে স্বতন্ত্র। প্রাথমিক প্রদাহে দেহ যে প্রতিরোধ ক্ষমতা ও অনুবেদনশীলতা অর্জন করে সেটাই এর কারণ। ডাঃ কচ গিনিপিগের দেহে এই ফেনোমনা বা পক্রিয়া প্রদর্শন করিয়েছেন। দেখা গেছে যে সম্পূর্ণ সুস্থ প্রাণীর দেহে প্রথমবার মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস বীজাণু ঢোকান হলে রোগের উদ্ভিকাল চৌদ্দ দিন এবং গন্ডিকাতে সত্বর ক্ষত সৃষ্টি হয়। ইনজেকশন স্থানে যে ক্ষত সৃষ্টি হয় তা সারে না, স্থানীয় লসিকা গ্রন্থি আক্রান্ত হয় ও রোগী ৬-১২ সপ্তাহের ভেতর মারা যায়।

পক্ষান্তরে, প্রাণী যদি পূর্বেই মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস দ্বার আক্রান্ত হয়ে থাকে তবে প্রতিক্রিয়া ভিন্ন রূপ ধারণ করে। রোগের উদ্ভিকাল সংক্ষিপ্ত (১-২ দিন) হয়; ক্ষত সেরে উঠে, কোন লসিকাগ্রন্থি আক্রান্ত হয় না ও প্রাণীটি প্রাণে বেঁচে যায়।

মৌলিক পরিবর্তন হলো আক্রান্ত কলায় টিউবারকুল সৃষ্টি হওয়া। টিউবারকুলকেই যক্ষ্মা প্রদাহের আণুবীক্ষণিক একক হিসাবে গণ্য করা হয়।

আণুবীক্ষণিক চিত্র : যক্ষ্মা প্রদাহের আণুবীক্ষণিক চিত্রের একক হলো টিউবারকুল। যার মূল চিত্রলেখা নিম্নরূপ :

মধ্যস্থলে কেসিয়েশন ধরনের কোষ-পচিতি বিদ্যমান থাকে। তার চতুর্দিকে এপিথেলয়েড কোষ ঘিরে থাকে। এর মাঝে অল্প হতে বহু সংখ্যক দৈত্য কোষ উপস্থিত থাকে। এদের কেন্দ্রকের সংখ্যা বহু এবং এরা কোষের কিনারে বিরাজ করে এবং কোষের সাইটোপ্লাজম সমসত্ত্ব ও লালচে। এদের ল্যাঙ্গহানের কোষ বলে।

টিউবারকিউল গঠনের ধারাবাহিক পর্যায়

(১) সর্বপ্রথমে প্রদাহ স্থানে তাৎক্ষণিক প্রবাহ-কোষ যেমন নিউট্রোফিলের সমাবেশ ঘটে। কিন্তু এ অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, কারণ এরা মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকিউলোসিসদের ভক্ষণ করতে পারে না ও ফলে মরে যায়।

(২) এর পরে আসে ম্যাকরোফেজ, যারা যক্ষার জীবাণুকে ভক্ষণ করে। কয়েকটি ম্যাকরোফেজের মধ্যে এরা ছড়িয়ে পড়ে যার ফলে তারা এপিথেলয়েড কোষের রূপ ধারণ করে। কয়েকটি এপিথেলয়েড কোষ এক সাথে মিশে দৈত্য কোষে পরিণত হয়।

(৩) সপ্তাহখানেক পর লিমফোসাইটর সমূহ এসে এপিথেলয়েড কোষের চার পাশে জড়ো হয়।

(৪) দশ হতে চৌদ্দ দিন পরে মধ্যবর্তী এলাকায় কোষ-পচিতি ঘটে যা কেজিয়াস শ্রেণীভুক্ত। হয় রক্ত-প্রবাহ বন্ধ হওয়া অথবা যক্ষ্মা জীবাণুর প্রতি কলার অতি সংবেদনশীলতা এর কারণ।

(৫) পরিশেষে ফাইব্রোব্লাসটসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে যারা প্রচুর পরিমাণ কোলাজেন স্থাপন করে থাকে।

আক্রান্ত স্থান ঃ দেহের যে-কোন অংশ যক্ষ্মা প্রদাহে আক্রান্ত হতে পারে। তবে যে সমস্ত অঙ্গ এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তারা হলো ফুসফুস, অন্ত্র, যোনীপথ, হাড়, বৃক্ক, লসিকা গ্রন্থি ইত্যাদি।

যে সমস্ত অঙ্গ যক্ষ্মায় প্রথম আক্রান্ত হয় তাদের প্রাথমিক স্থান বলে। দেহের অন্যান্য স্থানে প্রদাহ ছড়িয়ে পড়ার ফলে যে সমস্ত অঙ্গ আক্রান্ত হয় তাদের মাধ্যমিক স্থান বলে।

ফুসফুস সাধারণত প্রাথমিক স্থান ও হাড় সাধারণত মাধ্যমিক স্থান হিসাবে বিবেচিত।

পরিণাম ঃ যক্ষ্মা প্রদাহের পরিণাম নিম্নরূপ ঃ—

(১) রেসোলিউশন—প্রদাহ সম্পূর্ণ রূপে সেরে যায়। রোগের কোন চিহ্ন উপস্থিত থাকে না।

(২) তন্তুপ্রাচুর্য দ্বারা আরোগ্যলাভ—প্রদাহ স্থানে প্রচুর তন্তুপ্রাচুর্য ঘটে।

(৩) ক্যালসিফিকেশন—ক্ষত স্থানে ক্যালসিয়াম লবণের তলানী পড়ে।

(৪) ওসিফিকেশন—কদাচিৎ পাওয়া যায়।

(৫) ঠান্ডা পূঁজাক্তি গঠন—প্রদাহ স্থান তরলায়িত হয়ে পূঁজাক্তি সৃষ্টি হতে পারে।

সম্প্রসারণ ঃ যক্ষ্মা নিম্নলিখিত পথে বিস্তার লাভ করে ঃ

(১) সোজাসুজি বা সরাসরি পথে—ফুসফুস, বৃক্ক ও হাড়ের ক্ষেত্রে এ পথে অধিক হারে প্রদাহ সম্প্রসারিত হয়ে থাকে।

(২) লসিক প্রবাহ—এ পথেও প্রদাহ সম্প্রসারিত হয়। লসিকা গ্রন্থির যক্ষ্মা প্রধানত এভাবে সংগঠিত হয়।

(৩) রক্ত প্রবাহ—ক্যাজিয়েশনযুক্ত কলা যে ক্ষেত্রে রক্ত প্রবাহে প্রবেশ করতে সমর্থ হয় সেক্ষেত্রে দেহের বিভিন্ন অংশে তা ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে মিলিয়ারী টিবির উৎপত্তি ঘটে।

(৪) স্বাভাবিক পথে—যেমন ব্রনকাস, ইউরেটার ইত্যাদি নালীর মধ্য দিয়ে যক্ষ্মা প্রদাহ বিস্তার লাভ করতে পারে।

যক্ষ্মার বিরুদ্ধে বি. সি. জি. এক শক্তিশালী আত্মরক্ষামূলক টিকা। টিউবারকিউলিন নেগেটিভ শিশু বা ব্যক্তিদের বি. সি. জি. টিকা প্রদান করা কর্তব্য।

সারকয়েডোসিস

সারকয়েডোসিস এক জাতীয় ক্যাজিয়েশনবিহীন গ্রানুলোমা যার কারণ অজ্ঞাত। এর সাথে যক্ষ্মাজনিত প্রদাহের মিল আছে। ২০-৪০ বৎসর বয়স্করাই বেশী আক্রান্ত হয়; মেয়েদের চেয়ে ছেলেরাই বেশী। ভৌগোলিকভাবেও এর প্রাদুর্ভাবে প্রকারভেদ লক্ষ্য করা যায়। উত্তর ইউরোপে এর প্রাদুর্ভাব বেশী, তেমনি সাদাদের চেয়ে কালোরাই এতে ভোগে বেশী। বংশক্রমায়ত বা জেনেটিকও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

আক্রান্ত স্থান ঃ যে সমস্ত অঙ্গ এতে আক্রান্ত হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—(১) ফুস ফুস, (২) লসিকা গ্রন্থি, (৩) প্লীহা, (৪) চামড়া, (৫) যকৃত, (৬) চোখ, (৭) প্যারোটিড লালা গ্রন্থি, (৮) হাড় ইত্যাদি।

খালি চোখে দৃশ্যমান অবয়ব ঃ লসিকাগ্রন্থি ফোলা, চামড়ায় গন্ডিকা গঠন, রং পরিবর্তন ও আক্রান্ত অঙ্গের আকার বৃদ্ধি হিসাবে এরা আত্মপ্রকাশ করে থাকে।

আণুবীক্ষণিক চিত্র ঃ আণুবীক্ষণিক চিত্রের বৈশিষ্ট্য হলো এ ক্ষেত্রে যে গ্রানুলোমা সৃষ্টি হয় তা সংখ্যায় অধিক, সুস্পষ্টভাবে রেখায়িত ও মূলত এপিথেলয়েড কোষ দ্বারা গঠিত। ল্যাঙ্গহান কোষের সংখ্যা সীমিত ও কোষ পরিচিতি উপস্থিত থাকে না বললেই চলে। পরিবেষ্টিত তন্তুকলা লক্ষণীয়ভাবে উপস্থিত থাকে। পরের দিকে, এসটেরয়েড বডি, সুমন বডি জাতীয় ইলেক্ট্রন বডি উপস্থিত থাকে। এসটেরয়েড বডি, দৈত্য কোষের মধ্যে তারকা সুলভ এক বস্তু রূপে দেখা যায়। সুমান বডি নীলাভ স্তর বিশিষ্ট এক প্রকার পদার্থকে বুঝায়। এরা কোষের মধ্যে বিপাকজনিত কারণে সৃষ্ট পদার্থ অথবা কোষের ক্ষরণ হিসাবে পরিগণিত হয়।

হজকিনস রোগ, কুষ্ঠ রোগ, ছত্রাক রোগ ও ক্যান্সারগ্রস্ত লসিকা গ্রন্থিতে এ ধরনের আণুবীক্ষণিক চিত্র পাওয়া যায়।

যক্ষ্মা ও সারকয়েডের মধ্যে পার্থক্য

		সারকয়েড	যক্ষ্মা
১)	কোষ-পচিতি	অনুপস্থিত	উপস্থিত
২)	কিনারা	সুস্পষ্ট	অস্পষ্ট
৩)	দৈত্য কোষ	সংখ্যায় কম	বেশী
৪)	কেন্দ্রক	বেশী	কম
৫)	রেটিকিউলাম	প্রদর্শন করা যায়	যায় না
৬)	এসটেরয়েড বডি	থাকে	থাকে না
৭)	সুম্যান বডি	থাকে	থাকে না
৮)	কেভিম পরীক্ষা	হ্যাঁ-বাচক ফল দেয়	না-বাচক ফল দেয়

রাসায়নিক পরিবর্তন : রক্তে ক্যালসিয়াম ও প্রোটিন বিশেষ করে গ্লোবিউলিনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। আই. জি.—জি, আই. জি.-এম ও আই. জি.-এর মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

রোগজননতত্ত্ব : এ রোগের প্রকৃত কারণ এখনও অজ্ঞাত। নিম্নলিখিত মতবাদ চালু আছে :

(১) এরা অস্বাভাবিক জাতের যক্ষ্মা ;
(২) লিপিডসমৃদ্ধ বিভিন্ন দ্রব্যের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সৃষ্ট প্রদাহ ;
(৩) ইমিউনিটিজনিত গন্ডোগল—এ মতবাদই সর্বাপেক্ষা স্বীকৃত। ডিলেড টাইপ হাইপার সেনসিটিভিটি প্রতিক্রিয়ার কর্মতি ঘটে। টিউবারকিউলিন পরীক্ষা না-বাচক প্রতিক্রিয়া দেয়। কিন্তু সেলফ-মেডিয়েটেড ইমিউনিটি কমে না ;
(৪) এখনো জানা যায়নি এমন ভাইরাসজাত প্রদাহ ;
(৫) অটো ইমিউনিটি প্রতিক্রিয়া।

গতিধারা : শতকরা সত্তুর ভাগ ক্ষেত্রে এ রোগে কোন প্রকার উপসর্গ দেখা যায় না। এর গতিধারা নিম্নরূপ :

(১) তন্তু-প্রাচুর্য দ্বারা নিরাময় ঘটে, (২) ফুসফুসের কার্য ক্ষমতা হ্রাস পায়, (৩) সম্পূর্ণ ভাবে আরোগ্যলাভ হয়।

কুষ্ঠ রোগ

অম্লরোধী মাইকোব্যাকটেরিয়া—মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপরী দ্বারা সংঘটিত এক প্রকার গ্রানুলোমা জাতীয় প্রদাহকে কুষ্ঠ রোগ বলে।

মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপরী কৃত্রিম মেডিয়াতে জন্মাতে পারে না। এ শুধু

মাত্র মানুষের রোগ সৃষ্টি করতে পারে। তবে ইদানিং কালে গোল্ডেন হামসটারেও এদের রোগ সৃষ্টি করতে দেখা গেছে। আরমাডিলো নামে ক্ষুদ্র প্রাণীতে এদের জন্মান সম্ভব হয়েছে।

পৃথিবীর সর্বত্রই এ রোগের বিস্তার; যদিও গরম স্যাতসেঁতে আবহাওয়াতে এরা ভাল করে না।

আক্রান্ত রোগীর নাসিকা ও প্রদাহ স্থান হতে নিঃসৃত ক্ষরণই এ রোগের মূল উৎস। বহু বৎসরব্যাপী প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের পরই এক দেহ হতে অন্য দেহে জীবাণু স্থানান্তরিত হতে পারে। জীবাণু ছিলে যাওয়া চামড়ার মধ্য দিয়ে দেহে প্রবেশ করে ও স্নায়ুতে পেঁাছায়। অতঃপর সোয়ান কোষে পেঁাছায় যেখানে দীর্ঘদিন সুপ্ত অবস্থায় থাকে। এটাই রোগের সুপ্তিকালের দীর্ঘতার কারণ। সেখান থেকে জীবাণু দেহের বিভিন্ন অঙ্গে বিশেষ করে চামড়া ও স্নায়ুতন্ত্রে ছড়িয়ে পড়ে। অন্যান্য অঙ্গের মধ্যে বৃক্ক, যকৃত, প্লীহা অন্যতম।

শ্রেণীবিভাগ ঃ কুষ্ঠ রোগকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ

১। লেপরোমেটাস,
২। নিউরাল বা টিউবারকিউলয়েড বা এনেসথেটিক,
৩। মিশ্র,
৪। বর্ডারলাইন টিউবারকিউলার
৫। বর্ডারলাইন লেপরোমেটাস।

১। লেপরোমেটাস শ্রেণী

যে সমস্ত ব্যক্তিদের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম ও সহজেই জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হয় তাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রদাহ বেশী হয়। এদের রক্তে গামা গ্লোবিউলিনের মাত্রা বেশী। পক্ষান্তরে ডিলেড হাইপারসেনসিটিভিটির মাত্রা কম ও লেপরোমিন পরীক্ষা না-বাচক ফল দেয়।

অধিকাংশক্ষেত্রে চামড়া আক্রান্ত হয় বিশেষ করে মুখমন্ডল, কানের লতি, হাত ও পায়ের চামড়া। প্রথমে চামড়ার গায়ে বহু কালচে বা বাদামী রংএর ছাপ দেখা দেয়। পরে সেগুলো গন্ডিকা আকার ধারণ করে। সাধারণতঃ এরা ক্ষতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মুখের চামড়ায় কুঞ্চনরেখা সৃষ্টি হয়। এর সাথে কানের লতি গন্ডিকার হওয়ার ফলে সিংহের মুখের রূপ ধারণ করে। পরে আঙ্গুলের ক্ষত বাড়তে বাড়তে অঙ্গুলী খসে পড়ে। চামড়া ছাড়া দেহের অন্যান্য অঙ্গসমূহ আক্রান্ত হয়, যেমন লসিকা গ্রন্থি, স্নায়ু, যকৃত, প্লীহা ইত্যাদি।

আণুবীক্ষণিক চিত্র ঃ অণুবীক্ষণের নিচে এদের গ্রানুলোমা সুলভ প্রতীয়মান হয়। ম্যাকরোফেজ, এপিথেলয়েড কোষের সমন্বয়ে এরা গঠিত। লিমফোসাইটের সংখ্যা খুব কম থাকে। ম্যাকরোফেজসমূহে প্রচুর লিপিড বিদ্যমান থাকায় সাইটোপ্লাজমকে স্বচ্ছ সাবানের ফেনার মত দেখায়। এই

লিপিডের উৎস হলো ভক্ষিত মাইকোব্যাকটেরিয়াম। অম্লরোধী রঞ্জন পদ্ধতি দ্বারা এদের প্রদর্শন করা সম্ভব। মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপেরী-সমৃদ্ধ এই সমস্ত ম্যাকরোফেজদেরকে ভিরকোস কোষ অথবা লেপেরী কোষ বলে। অল্প সংখ্যক দৈত্য কোষও বিদ্যমান থাকতে পারে। গ্রানুলোমা-প্রসূত কলা বিস্তীর্ণ-ভাবে বিরাজ করে, যক্ষ্মায় যেমন স্তরে স্তরে থাকে তেমনভাবে থাকে না।

২। টিউবারকিউলয়েড শ্রেণী

যে সমস্ত রোগীর প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রখর তাদের ক্ষেত্রে এ শ্রেণীর প্রদাহ দেখা দেয়। রক্তে গ্লোবিউলিনের মাত্রা কম। পক্ষান্তরে ডিলেড হাইপারসেন্সি-টিভিটি বা দীর্ঘায়িত সংবেদনশীলতা বেশী পরিমাণে বিদ্যমান। লেপরোমিন পরীক্ষা হ্যাঁ-বাচক ফল দেয়। অমসৃণ বাদামী ছাপ হিসাবে রোগ শুরু হয় কিন্তু শীঘ্রই স্নায়ু আক্রান্ত হয়ে পড়ে যার ফলে স্নায়ুতন্ত্রে প্রদাহ দেখা দেয়। স্নায়ুতন্ত্র মোটা হয় যা চাপদিলে অনুভূত হয়। আক্রান্ত স্নায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত স্থানসমূহে অসাড়তা, অতিসংবেদনশীলতা, মাংসপেশীর শীর্ণতা, এর ফলে সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বিভিন্ন পরিবর্তন যেমন, ঘা দেখা দেয়।

আণুবীক্ষণিক চিত্র : এ ক্ষেত্রেও গ্রানুলোমা সাদৃশ্য পরিবর্তন দেখা দেয়। গ্রানুলোমা প্রচুর এপিথেলয়েড কোষ, প্লাজমা কোষ, লিমফোসাইট ও মনোনিউক্লিয়ার কোষের সমন্বয়ে গঠিত। দৈত্য কোষও প্রচুর দেখা যায়। স্নায়ুতন্ত্র বিনষ্ট হয়। কলায় কুষ্ঠ উৎপাদনকারী জীবাণু প্রদর্শন করা যায় না। তন্তু-প্রাচুর্য খুব লক্ষণীয়ভাবে বিদ্যমান।

৩। মিশ্র শ্রেণী

এ ক্ষেত্রে উপরোক্ত দু'প্রকার প্রদাহের লক্ষণাদি উপস্থিত থাকে।

জটিলতা : নিম্নলিখিত জটিলতা সাধারণত উপস্থিত থাকতে পারে :

(১) অঙ্গহানি, যেমন হাতের ও পায়ের আঙ্গুল পড়ে যাওয়া,
(২) কদর্যতা,
(৩) ক্ষত,
(৪) মৃত্যুর হার খুব কম।

রোগ নির্ণয় : সংক্ষেপে বলা যায় যে নিম্নলিখিত পদ্ধতি এ রোগ নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয় :

(১) সরাসরি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা—ক্ষতস্থান হতে সোয়াব বা স্ক্রাপিং নিয়ে ৫% সালফিউরিক অম্ল ব্যবহার করে অম্লরোধী রঞ্জন পদ্ধতি দ্বারা রঞ্জিত করে পরীক্ষা করা যায়।

(২) চামড়া পরীক্ষা—লেপরোমিন পরীক্ষা টিউবারকিউলয়েড শ্রেণীতে

হ্যা-বাচক ফল দেয়। কিন্তু লেপরোমেটাস শ্রেণীতে এ পরীক্ষা না-বাচক ফল দান করে।

সিফিলিস

সিফিলিস এক মারাত্মক যৌন রোগ যা টিপেনোমা প্যালিডাম নামক এক প্রকার স্পাইরেকিট দ্বারা সংঘটিত হয়। এ রোগের তিনটি পর্যায় আছে ঃ

(১) প্রাথমিক, (২) মাধ্যমিক, (৩) অন্তিম।

এখানে অন্তিম পর্যায় আলোচিত হয়েছে। মৌলিকভাবে এ গ্রানুলোমা জাতীয় প্রদাহ যেখানে 'গামা' সৃষ্টি হয়।

অন্তিম পর্যায়ে উপনীত হতে দেহে বীজাণু ঢোকার পর হতে বৎসর দু'-তিন সময় লাগে। চিকিৎসার অভাবে অথবা অপ্রতুলতার জন্য দ্বিতীয় পর্যায় অন্তিম পর্যায়ে পর্যবসিত হয়।

দেহের বিভিন্ন অঙ্গে এ ঘটতে পারে, যা দুপ্রকারে আত্মপ্রকাশ করে থাকে ঃ (ক) বিস্তীর্ণ, (খ) স্থানীয়ভাবে সংগঠিত — গামা।

(ক) **বিস্তীর্ণ প্রদাহ ঃ** এই প্রকার প্রদাহে নিম্নলিখিত অঙ্গসমূহ আক্রান্ত হয় ঃ

(১) অ্যাযোর্টা—অয়োর্টাইটিস, অয়োর্টিক এনিউরিজম, আয়োর্টিক ইনকম-পিটেনস, ইত্যাদি।

(২) ক্ষুদ্রতর রক্তনালী—যেমন, স্পাইনাল ধমনী, সেরেব্রাল ধমনী প্রদাহ।

(৩) মায়োকারডিয়াম—মায়োকারডাইটিস।

(৪) সেন্ট্রাল নার্ভাস সিসটেম বা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র—যেমন মেনিনজাই-টিস; টেবিজ ডরসালিস; জেনারেল প্যারালাইসিস অব ইনসেন ইত্যাদি।

(খ) **স্থানীয় প্রদাহ ঃ** এ ধরনের প্রদাহে স্থানীয়ভাবে সুস্পষ্ট রেখাঙ্কিত ক্ষত সৃষ্টি হয় যা হলদে এবং রবারের মত দৃঢ় হয়। একরূপ খাঁজ কাটা ক্ষত সৃষ্টি হয় যার মেঝে এক ধরনের চামড়ার মত দেখায়।

যকৃত, শুক্রাশয়, টিবিয়া, আলনা, দাঁতের ও চোয়ালের হাড় সাধারণতঃ আক্রান্ত হয়ে থাকে।

আণুবীক্ষণিক চিত্র ঃ মধ্যভাগে কোষ-পচিতি দেখা যায় যা কিছুটা কোয়াগুলেটিভ ও কিছুটা ক্যাসিয়েটিভ ধরনের। ফলে কোন কোন স্থানে কলার কাঠামো সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তার কিছু আভাস বিদ্যমান থাকে। স্পাইরেকিটের বিরুদ্ধে কলার অতিমাত্রায় সংবেদনশীলতাই এর

কারণ। কোষ-পরিচিতি যুক্ত স্থানের চতুস্পার্শ্বে অসংখ্য প্লাজমা কোষ, ম্যাক-রোফেজ, লিমফোসাইট ও ফাইব্রোব্লাস্ট বিরাজ করে। এপিথেলয়েড কোষ ও দৈত্য কোষও দেখা যায়। প্লাজমা কোষ ও লিমফোসাইট দ্বারা পরিবেষ্টিত এন্ড আর্টেরাইটিস অবলিটেরান্স দেখতে পাওয়া যায়।

এই চিত্রের সাথে টিউবারকিউলের দ্বারা সৃষ্ট প্রদাহের চিত্রের সাদৃশ্য আছে। যে সমস্ত বিষয়ে এদের মধ্যে তফাৎ ও যার দ্বারা এদের এক হতে অপরকে স্বতন্ত্র করা যায় তা নিম্নে দেওয়া হলো।

গামা ও টিউবারকিউলের মধ্যে তফাৎ

	টিউবারকিউল	গামা
১। দৈত্য কোষ ও এপিথেলয়েড কোষ	বেশী	কম
২। লিমফোসাইট	কম	বেশী
৩। ফাইব্রোসাইট	কোষ-পরিচিতি এলাকায় অনুপস্থিত	লক্ষণীয়ভাবে উপস্থিত
৪। রক্ত নালী	কম উপস্থিত	উপস্থিত
৫। আকার	ছোট	বড়
৬। সংখ্যা	একের অধিক	এক

ঊতের হিলিং/রিপেয়ার
(Healing of wound/Repair)

সংজ্ঞা

হিলিং ঃ প্রদাহের ফলে কলাতে যে কোষ-পরিচিতি ঘটে ও প্রদাহ ক্ষরণ সৃষ্টি হয়, তা যে পদ্ধতি দ্বারা অপসারিত হয় ও প্রদাহ দ্বারা সৃষ্ট কলার ফাঁক নূতন স্বাভাবিক কলা দ্বারা পূরণ হয় তাকে হিলিং বলে।

রিপেয়ার ঃ কলার পচনের জন্য সৃষ্টে ফাঁক যখন যথাক্রমে গ্রানুলেশন কলা ও তন্তু-প্রাচুর্য দ্বারা পূরণ হয়ে স্কার সৃষ্টি হয় তখন তাকে রিপেয়ার বলে। এ ক্ষেত্রে নূতন সৃষ্ট কলা আগের কলা হতে পৃথক।

যখন এই ফাঁক একই প্রকার কলা দ্বারা পূরণ হয় তখন তাকে রিজেনারেশন বলে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, এ ক্ষেত্রে যকৃতের ক্ষয়প্রাপ্ত কলা যকৃৎ-কলা দ্বারা স্থলাভিষিক্ত হয়।

যে-কোন প্রকার আঘাত বা ক্ষতের ক্ষেত্রে মৌলিকভাবে ক্ষতপূরণের পদ্ধতির ধরন সমান। তফাৎ শুধু মাত্রার তারতম্যে এবং তা নির্ভর করে নিম্নলিখিত নিয়ামকের উপর — (১) কতটা কলা বিনষ্ট হয়েছে তার উপর এবং (২) সাথে কোন সেপসিস বিদ্যমান কি না তার উপর।

হিলিং অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া এবং এর মধ্যে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অন্তর্গত : (১) ক্যাপিলারীর এনডোথেলিয়ামের সংখ্যা বৃদ্ধি (২) ফাইব্রোব্লাসটের সংখ্যা বৃদ্ধি, (৩) কোষ বিভাজন, (৪) কোলাজেনের তলানি পড়া, (৫) কলার রিজেনারেশন, (৭) রাসায়নিক প্রক্রিয়া ইত্যাদি।

হিলিং পদ্ধতির পর্যায় বিভিন্ন, যা হলো :

(১) প্রাথমিকভাবে রক্ত-জমাট বাঁধা।
(২) প্রদাহ পর্যায়,
(৩) ডিমোলিশন,
(৪) উন্ড বা ক্ষতের সংকোচন,
(৫) গ্রানুলেশন-কলা গঠন,
(৬) স্কার সংগঠন।

শ্রেণীবিভাগ : চামড়ার হিলিং দু'প্রকারের :
(১) হিলিং বাই ফার্স্ট ইনটেনশন বা প্রাথমিক হিলিং;
(২) হিলিং বাই সেকেন্ড ইনটেনশন বা মাধ্যমিক হিলিং।

(ক) প্রাথমিক ইউনিয়ন বা হিলিং

প্রাথমিক ইউনিয়ন নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সংগঠিত হয় :
(ক) যেখানে ক্ষতের ফাঁক খুব সামান্য, পরিষ্কার এবং কাটা ক্ষতের কিনারা সুস্পষ্ট ;
(খ) রক্তপাত অত্যন্ত কম ;
(গ) ক্ষরণের পরিমাণ নেই বললেই চলে ;
(ঘ) প্রদাহমুক্ত।

এ ক্ষেত্রে হিলিংএর নিম্নলিখিত পর্যায় বিদ্যমান :
(১) রক্তপাত ও রক্ত জমাট বাঁধা ; (২) প্রদাহ ; (৩) ডিমোলিশন ;
(৪) গ্রানুলেশন জাতীয় কলা গঠন ; (৫) এপিথেলিয়াম কলা সৃষ্টি ;
(৬) অর্গানাইজেশন।

পরিবর্তনের পর্যায়ক্রম বা অনুক্রম ঃ কাটা ফাঁকের পরস্পর সম্মুখীন দেওয়ালের মধ্যবর্তী ছোট পরিসর রক্তে পরিপূর্ণ হয় ও তা জমাট বাঁধে। ফলে স্থানটি পূরণ হয়ে যায়। ছিন্নির কলার মাঝে এবং কর্তিত কোষসমূহ উত্তেজক হিসাবে কাজ করে যার ফলে প্রদাহ সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে জীবাণু কোন ভূমিকা পালন করে না।

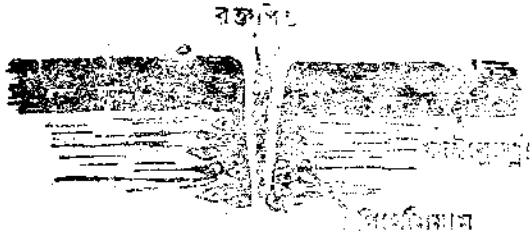

চিত্র ২০। প্রাইমারী ইউনিয়ন

এর পরে আসে ডিমোলিশন পর্যায়। কর্তিত কোষসমূহ হতে বিপাচক নিঃসৃত হয় এবং ম্যাকরোফেজ কোষের সমাগম ঘটে। এরা মৃত কোষসমূহ ও পুঞ্জক কোষসমূহদের অপসারণ করে ফেলে।

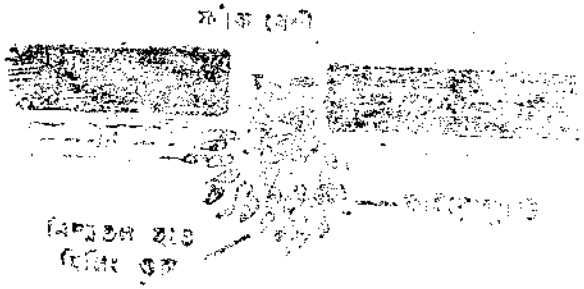

চিত্র ২১। সেকেণ্ডারী ইউনিয়ন

এরপর দুই প্রক্রিয়া একসাথে শুরু হয় যথা ঃ (১) ক্যাপিলারীর এনডোথেলিয়াম কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি ও (২) ফাইব্রোব্লাস্ট কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি।

আঘাত প্রাপ্ত ক্যাপিলারীর এনডোথেলিয়াম বড় হয়। এদের নিউক্লিয়াসে মাইটোসিসের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। দুপাশ থেকেই এরা বৃদ্ধি পেতে থাকে ফিব্রিন মাধ্যমের সাহায্যে পরস্পরের দিকে অল্প অল্প ভাবে এগিয়ে যায় ও পরস্পরের সাথে যোগ হয়। পরে এদের মধ্যে নালীর সৃষ্টি হয়।

একই সাথে ক্ষতের দু'ধার হতে ফাইব্রোব্লাস্ট কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি শুরু হয়। অনুচক্রিকা ও ম্যাকরোফেজ হতে নিসৃত বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যই এরজন্য দায়ী। ক্যাপিলারীর মত এ ক্ষেত্রেও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ফাইব্রোব্লাস্ট একইভাবে পরস্পরের দিকে এগিয়ে যায় ও একসাথে মিলিত হয়। এরা প্রচুর পরিমান কোলাজেন সৃষ্টি করে যা সংকুচিত হওয়ার ফলে তরঙ্গায়িত স্কার সৃষ্টি হয়। প্রথম অবস্থায় এক্ষেত্রে প্রচুর রক্তপ্রবাহ থাকার ফলে লালচে দেখায়। এ পর্যায়কে ভাসকুলারাইজেশন পর্যায় বলে।

পরে এনড-আরটেরাইটিস অবলিটেরান্স ও আরটেরিওলসমূহের শীর্ণতার জন্য রক্তপ্রবাহ কমে যায় ও ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে। এ পর্যায়কে এভাসকুলারাই-জেশন পর্যায় বলে।

পরে ক্ষতের উভয় দিক হতে এপিথেলিয়াম কোষ বৃদ্ধি পায় ও ক্ষতের উপর তলকে আচ্ছাদিত করে ফেলে। এখানে লোমকূপ, ঘামগ্রন্থি বা চামড়ার অন্যান্য বিশেষ অঙ্গ থাকে না। কারণ এ সমস্ত অঙ্গ পুনরায় জন্মাতে অক্ষম।

(খ) মাধ্যমিক হিলিং (Secondary Union)

প্রদাহ বা আঘাতের ফলে কোষ-ক্ষয় যখন ব্যাপক হয় তখন পাশ হতে কোষ বৃদ্ধির ফলে ফাঁক পূরণ সম্ভবপর হয় না। সে ক্ষেত্রে ক্ষতের নিচে বা মেঝে হতে গ্রানুলেশন কলা সৃষ্টির দ্বারা ক্ষতস্থান পূরণ হয়। এ পদ্ধতিকে সেকে-ন্ডারী ইউনিয়ন বা হিলিং বাই সেকেন্ড ইনটেনশন বলে।

পরিবর্তনের পর্যায়ক্রম : এ পদ্ধতির নিম্নলিখিত পর্যায় আছে :

(১) রক্তপাত ও রক্ত জমাট বাঁধা, (৪) ক্ষত-সংকোচন —খুব স্পষ্টভাবে লক্ষণীয়,
(২) প্রদাহ, (৫) গ্রানুলেশন-কলা সৃষ্টি,
(৩) ডিমোলিশন, (৬) স্কার গঠন।

সর্বপ্রথমে ক্ষতস্থানের ফাঁক জমাট বাঁধা রক্ত, ফিবরিন, প্রদাহ-জাত ক্ষরণ বিশেষ করে নিউট্রোফিল দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। এভাবে Laudable পুঁজ সৃষ্টি হয়। অতঃপর লিমফোসাইট ও ম্যাকরোফেজও হাজির হয়। ক্ষতস্থান লক্ষণীয়-ভাবে সংকুচিত হয়। যার ফলে শতকরা আশি ভাগ ফাঁক পূরণ হয়। এর কারণ সঠিকভাবে এখনও জানা যায়নি। তবে ক্ষরণের অপসারণ ও কোলাজেন তন্তুর সংকোচনই এর কারণ বলে মনে হয়। গ্রানুলেশন কলার চাপের ফলেই এর সৃষ্টি। এর পর প্রাথমিক হিলিং-এ যেমন ঘটে এখানেও ফাইব্রোব্লাস্ট ও ক্যাপি-লারীর এনডোথেলিয়াম কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা শুরু হয়

ক্ষতের তলা বা মেঝে হতে এবং তা উপরের দিকে খাড়াভাবে এগিয়ে চলে। উপর থেকে দেখলে এদের লাল, সূক্ষ্ম দানা দানা দেখায়, যেন এক কার্পেট। নিউট্রোফিল ও ম্যাকরোফেজও পাওয়া যায়। একে গ্রানুলেশন কলা বলে। পরবর্তী কালে ফাইব্রোব্লাস্টসমূহ প্রচুর পরিমাণে কোলাজেন সৃষ্টি করে যার ফলে Scar tissue উৎপন্ন হয়। ক্যালসিফিকেশন, হায়েলিনাইজেশন এমন কি অসিফিকেশনও সংগঠিত হতে পারে।

যে সমস্ত কারণাবলী কলা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় তারা হলো ঃ

১) ট্রিফোন নামক ক্ষত জারক—বীজাণু দ্বারা কোষের ধ্বংসাবশেষ হজম হওয়ার ফলে এমন কিছু দ্রব্য নির্গত হয় যা কোষ-বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে।

২) রাসায়নিক দ্রব্য— কোন কোন দ্রব্য যেমন ইউরিয়া, সালফাড্রিল কোষ বৃদ্ধিকারক হিসাবে কাজ করে।

৩) চাপের নতিমাত্রা (Pressure gradient)– স্বাভাবিক অবস্থায় কলাস্থ কোষসমূহ 'একের উপর এক' এই অবস্থায় বিরাজ করে। এর ফলে প্রত্যেক কোষের উপর চাপ বিদ্যমান থাকে যার ফলে তারা বাড়তে পারে না। কিন্তু প্রদাহ বা আঘাত পাওয়ার ফলে কোষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। ফলে এই নিয়ন্ত্রণ থাকে না এবং তখন কোষ বৃদ্ধি শুরু হয়।

যে সমস্ত নিয়ামক কলার হিলিংকে প্রভাবিত করে তারা হলো ঃ

১) বয়স— বয়স যত কম থাকে হিলিংও তত সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। কারণ কম বয়সে রক্ত প্রবাহের পরিমাণ পর্যাপ্ত।

২) পুষ্টি— পুষ্টি, বিশেষ করে আমিষ, ভিটামিন-ডি, ভিটামিন-সি হিলিংএর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

৩) এনডোক্রিন— করটিশন হিলিংকে দীর্ঘায়িত করে।

৪) রক্ত প্রবাহ বা রক্ত চলাচল— সুচারুভাবে হিলিং-এর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্ত প্রবাহের প্রয়োজন হয়। অন্যথায় হিলিং বিঘ্নিত হয়।

৫) প্রদাহের উপস্থিতি – প্রদাহ হিলিং-এর উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

৬) কোষ বিনষ্টির পরিমাণ— কোষ বিনষ্টি যত বেশী হিলিংও তত ধীর গতিতে চলে।

৭) নড়াচড়া— আক্রান্ত অঙ্গ স্থির না থেকে নাড়াচড়া করলে হিলিংয়ে ব্যাঘাত ঘটে।

৮) আক্রান্ত কলার প্রকারভেদ— বিভিন্ন অঙ্গের কলা বৃদ্ধির ক্ষমতা ভিন্নতর। যেমন এপিথেলিয়াম কলার পুনর্জনন (regeneration) সম্পূর্ণ রূপে সংগঠিত হতে পারে। পক্ষান্তরে স্নায়ু বা মাংস কলার পুনর্জনন হয় না। এই কারণে হিলিং-এর ধারা নির্ভর করে কোন্ প্রকার কলা আক্রান্ত হয়েছে তার উপর।

জটিলতা ঃ হিলিং-এর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত জটিলতা দেখা দিতে পারে ঃ

১) সংক্রমণ,
২) কেলয়েড সৃষ্টি হওয়া,
৩) সিকেট্রাইজেশন,
৪) ফেটে যাওয়া,
৫) পিগমেন্টেশন বা তন্তুরঞ্জন হওয়া।

৩
কলাবৃদ্ধির গণ্ডগোল

কোষের সংখ্যাবৃদ্ধির সুপ্তক্ষমতা

কোষের সংখ্যাবৃদ্ধির ক্ষমতা বিভিন্ন কলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন। এই ক্ষমতার উপর নির্ভর করে কোষদের নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

(১) **লেবাইল কোষ :** ক্ষয়প্রাপ্ত কোষসমূহের স্থলাভিষিক্ত হবার জন্য এ সমস্ত কোষ অবিকল পূর্বের কোষসমূহের ন্যায় কোষ সৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। আচ্ছাদনকারী এপিথেলিয়াম, অস্থিমজ্জা, লসিকা গ্রন্থির কোষসমূহ এর উৎকৃষ্ট উপমা।

(২) **স্টেবল কোষ :** উপরে উল্লেখিত কোষের ন্যায় এরাও সংখ্যাবৃদ্ধিতে সমর্থ কিন্তু তাদের ক্ষমতা সীমিত। কোন উত্তেজকের প্রতিক্রিয়া হিসাবে তাদের সংখ্যাবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পায়। মৃত কোষের অনুরূপ কোষ সৃষ্টিতে তারা সমর্থ হয়। প্যারেনকাইমা কোষ এর উপমা।

(৩) **পারমানেন্ট কোষ বা চিরস্থায়ী কোষ :** এরা পূর্ববর্তী কালের কোষের অনুরূপ কোষ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয় না। স্নায়ুতন্ত্র, মাংসকোষ এদের উপমা।

কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি বিবিধ নিয়ামকের উপর নির্ভরশীল। যেমন –

(১) বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার প্রয়োজনীয়তা।

(২) কোষের পূর্বসূরীর অনুরূপ কোষ সৃষ্টির ক্ষমতা।

(৩) কারসিনোমা সৃষ্টিকারী কোন পদার্থের প্রভাব বিদ্যমান থাকা ইত্যাদি।

কোষ বৃদ্ধির প্যাটার্ন বা ধারা নিম্নরূপ :

(ক) কোষএর সংখ্যা বৃদ্ধি

(১) এট্রফি বা শীর্ণতা; (২) এপ্লাসিয়া; (৩) হাইপোপ্লাসিয়া; (৪) হাইপারট্রফি; (৫) হাইপারপ্লাসিয়া।

(খ) কোষের ভেদাভেদের গণ্ডগোল ঃ

(১) মেটাপ্লাসিয়া বা কলা রূপান্তর, (২) ডিসপ্লেসিয়া।

(গ) টিউমার

(১) স্বল্প দৃষ্টগ্রাহী বা বেনাইন, (২) দৃষ্টগ্রাহী বা ম্যালিগনেন্ট।

এট্রফি বা কলাশীর্ণতা

পরিপূর্ণভাবে গঠিত স্বাভাবিক কলা অথবা অঙ্গের আকার যখন ছোট হয়ে পড়ে তখন তাকে এট্রফি বা শীর্ণতা বলে। আকারের এই হ্রাস প্রাপ্তি কোষের সংখ্যা কম হওয়া অথবা আয়তন ছোট হওয়ার ফলে সৃষ্টি হয়।

শ্রেণীবিভাগ ও কারণ

শীর্ণতাকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় ঃ

১। **ফিজিওলজী জনিত ঃ** দেহের প্রত্যেক অঙ্গ, বিশেষ করে, যৌনাঙ্গসমূহ বৃদ্ধ বয়সে শীর্ণ হয়ে পড়ে। লসিকা কলা ও থাইমাস গ্রন্থি যৌবনারম্ভে এবং ব্রঙ্কিয়াল ক্লেফট, নটোকর্ড, থাইরোগ্লোসাল ডাকট ভ্রূণেই শীর্ণ হয়। একে ইনভলুয়েশনও বলে।

২। **প্যাথলজী প্রসূত ঃ** বিভিন্ন রোগ অথবা অবস্থায় কলা ও অঙ্গসমূহ শীর্ণ হতে পারে। এদের দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় ঃ

(অ) জেনারেলাইজড ঃ (ক) অনাহার জনিত, (খ) বার্ধক্যজনিত।

(আ) স্থানীয় ঃ (ক) অব্যবহারজনিত, (খ) রক্ত প্রবাহজনিত, (গ) চাপ জনিত, (ঘ) এনড্রোক্রিনজনিত, (ঙ) অবসাদজনিত, (চ) স্নায়ুজনিত।

(ক) অব্যবহারজনিত শীর্ণতা ঃ কোন অঙ্গ অথবা কলা যদি দীর্ঘদিন-ব্যাপী অব্যবহৃত অবস্থায় থাকে তবে তা শীর্ণ হয়ে পড়ে।

উদাহরণ ঃ (১) কোন হাত বা পা যদি অস্ত্রোপচার দ্বারা কেটে বাদ দেওয়া হয় তবে স্পাইনাল কলমের এনটেরিয়ার হর্ন-কোষ শীর্ণ হয়ে থাকে। (২) অসাড় হয়ে পড়া অঙ্গের মাংশ পেশী শীর্ণতা লাভ করে। (৩) অগ্ন্যাশয়ের গ্রন্থি-কোষ অগ্ন্যাশয় নালীর প্রতিবন্ধকতার ফলে শীর্ণ হয়।

এর কার্যকারণ সম্বন্ধে ধারণা করা হয় যে অব্যবহৃত অঙ্গে রক্তের প্রয়োজন কম হওয়ার ফলে রক্তনালী সরু হয় যার ফলে অঙ্গের পুষ্টিহীনতা সৃষ্টি হয়। ফলে তা শীর্ণ হয়ে পড়ে।

(খ) রক্ত প্রবাহজনিত : অঙ্গের রক্ত প্রবাহ যদি ধীরে ধীরে হ্রাস পায় তবে কোষসমূহ মরে যায় এবং সেখানে তন্তু-প্রাচুর্য দেখা দেয়। রক্ত প্রবাহ হ্রাস পাওয়ার মুখ্য কারণ হলো আরটেরিও স্ক্লেরোসিস বা ধমনী কাঠিন্য। বিভিন্ন কারণে রক্তনালীর উপর চাপ সৃষ্টি হয় যেমন টিউমারের জন্যও তা ঘটতে পারে।

চিত্র ২২ এট্রফি/শীর্ণতা

(গ) চাপজনিত শীর্ণতা : কোন অঙ্গে অথবা কলায় যদি দীর্ঘদিনব্যাপী উচ্চ চাপের প্রভাবে থাকে তবে তা শীর্ণ আকার ধারণ করে। কলার উপর চাপের সরাসরি প্রভাবে এ ঘটতে পারে অথবা রক্ত নালীর উপর চাপের ফলে রক্তপ্রবাহ ব্যাহত হয়ে পুষ্টিহীনতা সৃষ্টির কারণে তা উদ্ভূত হতে পারে। চাপ প্রয়োগকারী বস্তু হিসাবে নিম্নলিখিত উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে : (১) টিউমার, (২) এনিউরিসমাল স্যাক, (৩) কোষসমূহের অন্তর্বর্তী স্থানে তলানী পড়া—এম্যাইলয়েড।

(ঘ) **অবসাদজনিত শীর্ণতা :** কোন অঙ্গ অথবা কলা যদি ক্রমাগত ভাবে দীর্ঘদিন কাজ করে চলে তবে অবশেষে তা শীর্ণ হয়ে পড়ে। এর কারণ সম্বন্ধে ধারণা করা হয় যে অধিক পরিমাণে অম্লযুক্ত বিপাকীয় দ্রব্য উৎপন্ন হওয়ার ফলে অপচিতিসুলভ বিজারক ক্রিয়ার পরিমাণ বেড়ে যায়। এর ফলে কোষের প্রটোপ্লাজম আঘাতপ্রাপ্ত হয়।

নিম্নলিখিত উপমা উল্লেখযোগ্য : (১) দেহের প্রচুর প্রয়োজন মেটানোর জন্য এডরিনালিন ও থাইরয়েড গ্রন্থি অত্যধিক কাজ করার পর শীর্ণ হয়ে পড়ে।

(ঙ) **এনডোক্রিনজনিত শীর্ণতা :** দেখা গেছে যে, যে সমস্ত অঙ্গ এনডোক্রিন বা অন্তর্স্রাবী গ্রন্থির উপর নির্ভরশীল যেমন এনটেরিয়র পিটুইটারী গ্রন্থি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেএডরিনাল গ্রন্থি,শীর্ণ হয়ে পড়ে।

(চ) **স্নায়ুজনিত শীর্ণতা :** দুর্ঘটনার কারণে কোন মটর স্নায়ু ধ্বংস-প্রাপ্ত হয় তবে উক্ত স্নায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পেশীসমূহ শীর্ণ হয়ে পড়ে। পলিওমায়েলাইটিস, মটর স্নায়ু জাত রোগ ইত্যাদি এর উদাহরণ।

(ছ) **অনাহারজনিত শীর্ণতা :** অনাহারের মাত্রা অত্যধিক হলে আক্রান্ত মাংসকলার শীর্ণতা ঘটে।

(জ) **বার্ধক্যজনিত শীর্ণতা :** বৃদ্ধ বয়সে সমস্ত কলা ও অঙ্গ বিশেষ করে যৌনাঙ্গ ও স্নায়ুতন্ত্রের শীর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে। একে ফিজিওলজিজনিত শীর্ণতার অংশ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

(ঝ) **ইডিওপ্যাথিক অথবা কারণ না জানা শীর্ণতা :** বহু ক্ষেত্রে কলার শীর্ণতা প্রাপ্তির কোন কারণ পাওয়া যায় না।

হাইপারট্রফি (কলার অতিবৃদ্ধি)

অঙ্গের অন্তর্গত কোষের আকার বৃদ্ধির ফলে সেই অঙ্গের আকার যখন বৃদ্ধি পায় তখন তাকে হাইপারট্রফি বা অতিবৃদ্ধি বলে।

হাইপারপ্লাসিয়া বা কলা বিবর্ধনের সাথে এর তফাৎ হলো যে, এ ক্ষেত্রে কোষের আকার বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে কলা বিবর্ধনে, কোষের সংখ্যা ও আকার দুই-ই বৃদ্ধি পায়। মেকানিকাল বা যান্ত্রিক কারণই এর জন্য দায়ী। পক্ষান্তরে কলা বিবর্ধন রাসায়নিক দ্রব্য ও হরমোন দ্বারা সংগঠিত হয়। কলা বিবর্ধন ও অতিবৃদ্ধি এই দুই অবস্থা পরস্পর ওৎপ্রতভাবে জড়িত।

আর বৃদ্ধি হতে পারে না সেরূপ পরিপূর্ণভাবে গঠিত অঙ্গে কলার অতি-বৃদ্ধি হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, যে সমস্ত কলাতে বৃদ্ধি এখন ও সম্পূর্ণ হয়নি এবং সেখানে আরও বৃদ্ধি সম্ভব, সে সমস্ত কলাতে কলা বিবর্ধন সংগঠিত হয়।

শ্রেণীবিভাগ

প্রধানত কলার অতিবৃদ্ধিকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় :

(ক) **ফিজিওলজি-জনিত :** এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো গর্ভধারণ। এক্ষেত্রে জরায়ু ও মাংসপেশীর আকার স্বাভাবিকের চেয়ে বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য উদাহরণ হলো খেলোয়াড়ের ও কামারদের মাংসপেশীসমূহ।

(খ) **রোগজনিত—(১) Compensatory :** যখন কোন অঙ্গের কার্যক্রম বৃদ্ধি পায় তখন তার মাংসকলার আকারও বৃদ্ধি পায়। উচ্চরক্তচাপে

হৃৎপিন্ডের কাজ বেশী বেড়ে যায় কারণ প্রান্তিক বাধা কাটিয়ে ওঠার জন্য তাকে আরও জোরের সাথে সংকোচন করতে হয়। ফলে তার মাংসপেশীর আয়তন

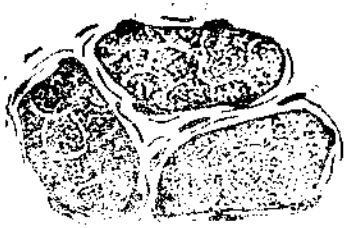

চিত্র ২৩। অতিবৃদ্ধি

বৃদ্ধি পায়। দ্বিপার্শ্বিকভাবে অবস্থিত অঙ্গের কোন একটি অসুস্থ অথবা বিকল হলে অন্যটির আরও বৃদ্ধি ঘটে যেমন একটি বৃক্ক অপসারিত হলে দ্বিতীয় বৃক্ক আরও বড় হয়ে থাকে।

(২) **Adaptive বা অভিযোজিত ঃ** ফাঁপা অঙ্গের বহির্গমনের পথে যদি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় তবে তার দেওয়ালের মাংসপেশীর অতি বৃদ্ধি ঘটতে দেখা যায়। কারণ নূতন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য দৃঢ়তরভাবে এর সংকোচনের প্রয়োজন হয় যাতে অভ্যন্তরস্থ দ্রব্যাদি বাইরে বের করে দিতে পারে। উদাহরণ— (অ) পেপটিক আলসারের ক্ষেত্রে পাইলোরিক স্টেনোসিস। (আ) এসোফেগোসাসের সংকুচনতা। (ই) মূত্র প্রবাহের প্রতিবন্ধকতায় মূত্রনালীর অবস্থা ইত্যাদি।

সাধারণভাবে আক্রান্ত অঙ্গ ঃ যে সমস্ত অঙ্গে কলার অতিবৃদ্ধি সংগঠিত হয় তারা হলো—মাংসপেশী হৃৎপিন্ড, বৃক্ক, জরায়ু, অন্তস্রাবী গ্রন্থিসমূহ, অন্ত্রের মাংসপেশী, পাকস্থলী, মূত্রাশয়।

কারণ

অঙ্গের অতিরিক্ত কার্যকারিতা ও হরমোনই অতিবৃদ্ধির মূল কারণ।

কলা বিবর্ধন (Hyperplasia)

কোষের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট কোন অঙ্গের আকার বৃদ্ধিকে কলা বিবর্ধন বলে।

এস্ট্রোজেনেসিসের পরও বৃদ্ধি পেতে পারে এমন কোষের সমন্বয়ে যে সমস্ত অঙ্গ গঠিত সেখানে কলা বিবর্ধন সংঘটিত হতে পারে। রাসায়নিক ও হরমোনের প্রভাব এর কারণ। এ প্রভাব অপসারিত হলে কলা বিবর্ধন বন্ধ হয়।

চিত্র ২৪। হাইপার প্লেসিয়া

শ্রেণীবিভাগ

কলা বিবর্ধনকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় :

(১) ফিজিওলজী-জনিত—যেমন বয়ঃসন্ধিকালে স্তনের আকার বৃদ্ধি,

(২) প্যাথলজী-জনিত।

কারণ : কলা বিবর্ধনের মূল কারণ হলো হরমোনের প্রভাব। বিবিধ রোগে কলা বিবর্ধন সংঘটিত হতে পারে। যেমন :—

স্তন	—ম্যামারী ডিসপ্লেসিয়া, গাইনাকোমাসটিয়া
প্রসটেট গ্রন্থি	—হাইপারপ্লাসিয়া
জরায়ু	—জরায়ুর কলা বিবর্ধন
থাইরয়েড	—গ্রেভেস এর অসুখ
অস্থি মজ্জা	—রক্তশূন্যতা
বৃক্ক	—এক বৃক্ক অপসারণের ফলে দ্বিতীয় বৃক্কের কলা বিবর্ধন ঘটে।
চামড়া	—সিউডোকারসিনোমা-সুলেভ হাইপারপ্লাসিয়া।
আর. ই. সিসটেম	—রিএ্যাকটিভ কলা বিবর্ধন।

কলা রূপান্তর (Metaplasia)

পরিপূর্ণভাবে গঠিত এক শ্রেণীভুক্ত কলার অন্য এক শ্রেণীর কলায় রূপান্তরিত হওয়াকে কলা রূপান্তর বলে। এই সংজ্ঞার এক ফাঁক হলো যে এক

শ্রেণীর এপিথেলিয়াম অন্য আর এক শ্রেণীর এপিথেলিয়ামে রূপান্তরিত হয়। সেরূপ এক শ্রেণীর সংযোজন কলা অন্য প্রকার সংযোজন কলায় রূপান্তরিত হয়। এপিথেলিয়াম কলা সংযোজন কলায় অথবা তার উল্টো অর্থাৎ সংযোজন কলাতে এপিথেলিয়াম কলাতে রূপান্তর হয় না।

শ্রেণীবিভাগ

কলা রূপান্তরকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ

১) এপিথেলিয়াল বা উপঝিল্লি জাত। (২) সংযোজন কলাজাত।

উপঝিল্লী জাত

১) স্কোয়ামাস উপঝিল্লি কলা রূপান্তর।

২) কলিউমনার উপঝিল্লি কলা রূপান্তর।

স্কোয়ামাস উপঝিল্লি কলা রূপান্তর ঃ এ ক্ষেত্রে কলিউমনার উপঝিল্লি স্কোয়ামাস উপঝিল্লিতে রূপান্তরিত হয়। শ্বাসনালী, মূত্র নালী, যৌনাঙ্গের উপঝিল্লির ক্ষেত্রে সাধারণত এ ধরনের রূপান্তর ঘটে।

আক্রান্ত অঙ্গসমূহ ঃ যে সমস্ত অঙ্গে কলা রূপান্তর সংঘটিত হয় তারা হলো ঃ

সারভিক্স— দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহে

ব্রনকাস —ধূমপান, ব্রনকাস-প্রদাহ ব্রনকিয়াকটেসিস।

পিত্তথলি—দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ, পিত্ত পাথর।

বৃক্ক
মূত্রাশয়] পাথর, দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ।

টিউমার —প্রস্টেট গ্রন্থির এডিনোকারসিনোমা।

ভিটামিন এ-এর অভাব।

স্তম্ভাকার (কলিউমনার) কলা রূপান্তর ঃ কদাচিৎ স্কোয়ামায়াস উপঝিল্লি কলা রূপান্তরিত হয়ে থাকে। সিউডোস্ট্রাটিফায়েড উপঝিল্লি সাধারণ কলিওমনার বা স্তম্ভাকার উপঝিল্লিতে পরিবর্তিত হতে পারে। উদাহরণ ব্রনকিয়েকটেসিস, ব্রনকাইটিস ইত্যাদি।

সংযোজক কলাজাত কলা বিবর্ধন

এক শ্রেণীভুক্ত সংযোজক কলা প্রায়ই অন্য শ্রেণীভুক্ত সংযোজক কলায় পরিবর্তিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে যে ক্ষতচিহ্ন, দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ

রক্ত নালীর কাঠিন্য, উপাস্থি (cartilage) ও হাড় উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। এ ছাড়া মায়োসাইটিস অসিফিকানসএর ক্ষেত্রে মাংসে ও কোন কোন শ্রেণীর টিউমারের অন্তর্বর্তী কলাতেও হাড় ও উপাস্থির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

কাজ ও উপকারিতা

কলা রূপান্তরের উদ্দেশ্য হলো ঃ-পরিবর্তিত পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য কার্যধারা পরিবর্তনের যে প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তা অর্জনের জন্য এই কলা-রূপান্তর সহায়ক হয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে জরায়ুর প্রলাপসের ক্ষেত্রে জরায়ুকে অধিকতর সংঘর্ষের যে সম্মুখীন হতে হয় স্কোয়ামাস উপঝিল্লির বাইরের আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা বেশী হওয়ার ফলে এ অধিকতর সহায়ক হয়।

ডিসপ্লেসিয়া

ডিসপ্লেসিয়া বলতে এমন এক অবস্থাকে বোঝায় যেখানে পূর্ণভাবে গঠিত কলার যে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে তার প্রকৃতি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও অস্বাভাবিকতায় ভরা।

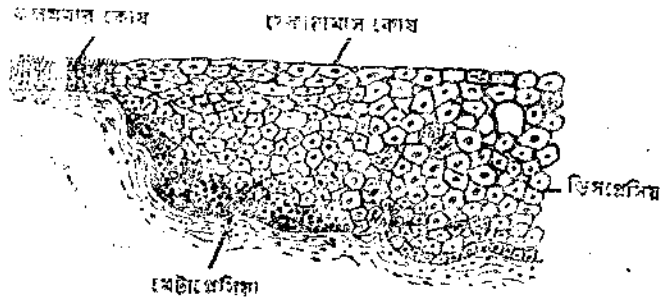

চিত্র ২৫ ডিসপ্লেসিয়া

কোষ ও তার অন্তর্গত কেন্দ্রিকার আকারে-আকৃতিতে ও অবস্থানে বৈচিত্রতা পরিলক্ষিত হয়। দুষ্টগ্রাহী কোষের ক্ষেত্রে যতটা অস্বাভাবিকতা দেখা যায় ততটা না হলেও প্রায় কাছাকাছি থাকে।

স্কোয়ামাস বা স্তরীয় উপঝিল্লি ডিসপ্লেসিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় স্কোয়ামাস উপঝিল্লি পুরু হয় এবং এর বিভিন্ন স্তরের গঠনে এলোমেলো ভাব বিদ্যমান থাকে। কিন্তু কেরাটিনাইজেশন এ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক থাকে ও মাইটোসিসে কোন অস্বাভাবিকতা দেখা যায় না। দৈত্য কোষ অনুপস্থিত থাকে।

দীর্ঘস্থায়ী কোন উত্তেজকের প্রভাবেই এ অবস্থার সৃষ্টি। বিভিন্ন দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহে ও ক্যান্সারের আনাচে-কানাচে এই অবস্থা পাওয়া যায়।

একে ক্যান্সারের পূর্ব অবস্থা বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এ অবস্থা পরিবর্তনশীল এবং এর জন্য দায়ী বিরামকসমূহ দূরীভূত হলে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে।

এনাপ্লাসিয়া

(আদি কোষান্তরণ)

এনাপ্লাসিয়া এমন এক অবস্থা যেখানে পুনর্গঠিত কোষসমূহ পশ্চাৎগামী ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে রূপান্তরিত হয়। কলার মধ্যস্থ কোষসমূহের কাঠামোর গঠন সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। এলোমেলোভাবে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে, আকারে ও আকৃতিতেও বৈচিত্র্য ঘটে। কেন্দ্রিকাসমূহের আকার বৃদ্ধি পায় এবং একের সাথে অপরের প্রচুর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কেন্দ্রস্থ ক্রোমাটিন এলোপাতাড়িভাবে পুঞ্জীভূত হয়ে বিরাজ করে। যার ফলে তাদের হাইপারক্রোমাটিন দেখায়। অস্বাভাবিক মাইটোসিসেরও দেখা মেলে।

চিত্র ২৬। এনাপ্লেসিয়া

এনাপ্লাসিয়া দুষ্টগ্রাহিতার এক বিশ্বাসযোগ্য চিহ্ন। ডিসপ্লেসিয়া হতে এর উদ্ভব হতে পারে অথবা একেবারেই নূতনভাবেও এর শুরু হতে পারে। একবার দেখা দিলে তার আর পরিবর্তন হয়ে স্বাভাবিক হবার সম্ভাবনা থাকে না। দুষ্টগ্রাহী টিউমারে এ অবস্থা পাওয়া যায়।

অন্যান্য গাঠনিক গণ্ডগোল

কোষের অন্যান্য গাঠনিক গন্ডগোলের বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া হলো :-

এজেনেসিস বলতে গঠিত হতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে অনুপস্থিতিকে বোঝায়।

কোন অঙ্গের অপরিপূর্ণভাবে সংগঠিত হওয়াকে **হাইপোপ্লাসিয়া বলে।**

স্বাভাবিক স্থান হতে অন্য কোন স্থানে কোন অঙ্গের উপস্থিতিকে **একটোপিয়া**, হেটারোপিয়া অথবা এব্যারেন্স বলে।

হামারটোমা বলতে টিউমার সাদৃশ্য এমন স্ফীত কলাকে বোঝায় যেখানে উক্ত স্থানের জন্য স্বাভাবিক বিভিন্ন প্রকার কলা উপাদান বিদ্যমান থাকে।

ডিসক্যারিওসিস বলতে ঝরে পড়া কোষের অস্বাভাবিক অবস্থা বোঝায়। কেন্দ্রক-সমূহে অস্বাভাবিকত্ব থাকে কিন্তু তা দৃষ্টগ্রাহিতায় দৃষ্ট নয়। এদের অল্প দৃষ্টগ্রাহী অবস্থায় পাওয়া যায় (যেমন প্রদাহ, উত্তেজনা)। কিন্তু এরা দৃষ্টগ্রাহী ও তার পূর্বেকার অবস্থাতেও বিদ্যমান থাকতে পারে।

ম্যালফরমেশন বলতে কলার গঠনকালের ত্রুটির ফলে উদ্ভূত অস্বাভাবিক অবস্থাকে বোঝায়।

ডিসট্রফি বলতে কলার পুষ্টিজনিত গণ্ডগোলের জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতিকে বোঝায়। সুপারফেসিয়াল কেরাটোসিস, সেবোরিক কেরাটোসিস, মাসকুলার ডিসট্রফি এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

কোন কোন ক্ষেত্রে ভ্রূণে থাকাকালীন অবস্থায় বিভাজিত হওয়ার বিফলতার ফলে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। যেমন ক্লেফট প্যালেট, স্পাইনা বাইফিডা কোন ফাঁকা অঙ্গে নালিকা সংগঠনের বিফলতাও অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, ইনপারফোরেট এনাস।

৪
টিউমার

সংজ্ঞা

প্রাচীনকালে দেহের কোন স্থানের স্ফীতি হওয়াকে টিউমার বলা হত তা সে যে-কোনভাবেই সৃষ্টি হোক না কেন। প্রদাহের জন্য হোক, অসঙ্গত গঠনের জন্য হোক বা প্রকৃত টিউমারের জন্য সৃষ্টি হোক তা টিউমার বলেই গণ্য হত। কিন্তু এ ধারণা পরিত্যক্ত হয়েছে। এখন টিউমার বলতে কলার স্ফীতি বোঝায় যাতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

কোষবৃদ্ধি অস্বাভাবিক ও এলোপাতাড়িভাবে ঘটে; এই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কোষের কোন উদ্দেশ্য নেই; বৃদ্ধির হার স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুততর এবং কারণ অপসারিত হলেও কোষ বৃদ্ধি থামে না বরং পূর্বের গতিতে ও ধারাতে চলতেই থাকে।

শ্রেণীবিভাগ

ক) নিদানিক ধারার প্রেক্ষিতে টিউমারকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে :

১) **অল্প দুষ্টগ্রাহী** (Benign) : এই শ্রেণীর টিউমার অপেক্ষাকৃতভাবে কম ক্ষতিকর, ধীরে ধীরে বাড়ে, একই স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে; দেহের অন্যত্র ছড়ায় না। পার্শ্ববর্তী কলাকে ধ্বংস করে না এবং আক্রান্ত রোগীর বিশেষ ক্ষতি সাধন করে না। উদাহরণ—এডিনোমা, প্যাপিলোমা।

২) **দুষ্টগ্রাহী** (Malignant) : এ জাতীয় টিউমার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়; পার্শ্ববর্তী কলাতে অনুপ্রবেশ করে এবং ধ্বংস করে। দূরবর্তী অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। রোগীর ভবিষ্যৎ খুব অন্ধকারময়। প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যু ঘটে। উদাহরণ—এডিনো কারসিনোমা।

৩) **মধ্যবর্তী টিউমার** (স্থানীয়ভাবে দুষ্টগ্রাহী টিউমার) : কোন কোন টিউমার স্থানীয় কলাতে অনুপ্রবেশ করে কিন্তু দূরবর্তী অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে না, এদের স্থানীয়ভাবে দুষ্ট গ্রাহী টিউমার বলে। উদাহরণ—ব্যাসাল সেল কারসিনোমা, কারসিনয়েড টিউমার ইত্যাদি।

খ) হিস্টোলজী ও সাইটোলজীজনিত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে টিউমারদের কোন্ কলা হতে উৎপন্ন হয়েছে তার ভিত্তিতে শ্রেণীভুক্ত করা হয়ে থাকে। যদি তন্তুকলা হতে উৎপন্ন হয় তবে তাদের ফাইব্রোমা বলে। যদি হাড় হতে উত্থিত হয়ে থাকে তবে অসটিওমা বলে এবং গ্রন্থি হতে উত্থিত হলে বলে এডিনোমা।

টিউমারের নামকরণ

স্বল্প দুষ্টগ্রাহী টিউমারের ক্ষেত্রে যে কলা হতে তা উত্থিত হয় তার ইংরেজী নামের শেষে 'ওমা' যুক্ত করে তার নামকরণ করা হয়। যেমন লাইপোমা, ফাইব্রোমা।

এপিথেলিয়াম বা উপঝিল্লীর দুষ্টগ্রাহী টিউমারকে কারসিনোমা বলে এবং সংযোজক কলার দুষ্টগ্রাহী টিউমারকে সারকোমা বলে। অনেক ক্ষেত্রে টিউমারের কোষসমূহ এত বেশী অবিভেদিত হয় যে তখন কোন্ কলা হতে উৎপন্ন হয়েছে তা বোঝা যায় না। সে ক্ষেত্রে টিউমারকে এনাপ্লাসটিক টিউমার বলে।

টিউমারের শ্রেণীবিভাগ

কলা	স্বল্পদুষ্টগ্রাহী	দুষ্টগ্রাহী
উপঝিল্লী	প্যাপিলোমা	ট্রানজিশনাল সেল কারসিনোমা, স্কোয়ামাস সেল কারসিনোমা
	এডিনোমা	এডিনোকারসিনোমা
সংযোজন কলা		
১। ফাইব্রাস কলা	ফাইব্রোমা	ফাইব্রোসারকোমা
২। এডিপোস কলা	লাইপোমা	লাইপোসারকোমা
৩। কারটিলেজ	কনড্রোমা	কনড্রোসারকোমা
৪। হাড়	অসটিওমা	অসটিওজেনিক সারকোমা
৫। মিক্সোমাটাস কলা	মিক্সোমা	মিক্সোসারকোমা
৬। নটোকর্ড	করডোমা	করডোসারকোমা
৭। মসৃণ পেশী	লিওমায়োমা	লিওমায়োসারকোমা
৮। সঞ্চালক পেশী	র‍্যাবডোমায়োমা	র‍্যাবডোমায়ো সারকোমা
৯। নিউরালজিয়া	—	এসট্রো সাইটোমা, গ্লায়োব্লাসটোমা মেডুলোব্লাসটোমা

১০। প্রান্তিক স্নায়ু	নিউরোফাইব্রোমা নিউরোলিলোমা সিওসোমা	নিউরোফাইব্রো সারকোমা
রক্ত নালিকা	হেমানজিওমা লিমফানজিওমা	হেমানজিও সারকোমা লিমফানজিও সারকোমা
লসিকা গ্রন্থি	—	ম্যালিগন্যান্ট লিমফোমা হজকিনের অসুখ
রক্ত উৎপাদক কলা	—	লিউকেমিয়া
আর ই সিসটেম	—	মালটিপোল মায়েলো হিসটো সাইটোসিস-এস
রঞ্জক উৎপাদন কলা	নিভাস	মেলানো কারসিনোমা
ট্রোপোব্লাস্ট	হাইডাটিডি ফরম মোল	করিওকারসিনোমা
জার্ম কোষ	বেনাইন টেরাটোমা	ম্যালিগন্যান্ট টেরাটোমা
সাইনোভিয়াল কলা	ফাইব্রো জানথোমা জায়েন্ট সেল টিউমার অব টেনডন সিথ	সাইনোভিওসারকোমা
মেসোথেলিয়াম	বেনাইন মেসোথেলিওমা	ম্যালিগন্যান্টমেসোথেলিওমা
মেনিনজেস	মেনিনজিওমা	ম্যালিগন্যান্ট মেনিনজিওমা

দুষ্টগ্রাহী টিউমারের বৈশিষ্ট্য ঃ দুষ্টগ্রাহী টিউমারের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ নীচে বর্ণনা করা হলো ঃ

(১) কোষ বৃদ্ধি দ্রুততর

দুষ্টগ্রাহী টিউমার অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। যেখানে স্বল্পদুষ্ট-গ্রাহী টিউমার সর্বাপেক্ষা বড় আকার ধারণ করতে কয়েক বৎসর সময় লাগে সেখানে দুষ্টগ্রাহী টিউমার অল্প সময়েই সে আকার ধারণ করে। বিভিন্ন দুষ্টগ্রাহী টিউমারের কোষবৃদ্ধির হার ভিন্নতর। কোন কোন শ্রেণীর ক্ষেত্রে এর হার অত্যন্ত দ্রুত। পক্ষান্তরে কোন কোন ক্ষেত্রে এর হার আপেক্ষাকৃত কম দ্রুত। যেমন সেমিনোমা, রেনালসেল কারসিনোমা অপেক্ষাকৃত কম দ্রুততার সাথেও করিওকারসিনোমা অত্যধিক দ্রুত হারে বাড়ে।

দুষ্টগ্রাহী টিউমারের আকার বৃদ্ধির দ্রুততার কারণ হলো দুটো—প্রথমতঃ দুষ্টগ্রাহী কোষ পরজীবী সুলভ ক্ষমতা রাখে। দ্বিতীয়তঃ এদের আমিষ

সংশ্লেষণ করার ক্ষমতা অনেক বেশী। এই কোষবৃদ্ধি প্রতিফলিত হয় মাইটোসিসের আধিক্যে (প্রতি হাজার কোষে দশটি)।

পক্ষান্তরে স্বল্প দৃষ্টগ্রাহী টিউমার ধীরগতিতে বাড়ে এবং সর্বাপেক্ষা বৃহৎ আকার ধারণ করতে বহু বৎসর সময় লাগে।

(২) অনুপ্রবেশ করার ক্ষমতা

স্বল্প দৃষ্টগ্রাহী টিউমার বাইরের দিকে বাড়ে। পার্শ্ববর্তী কলা সংকুচিত হয় যার ফলে একটা ক্যাপসুল বা বহিরাবরণ গঠিত হয়। কিন্তু দৃষ্টগ্রাহী টিউমার এবড়োথেবড়োভাবে বাড়তে থাকে ও আক্রান্ত অঙ্গের কলার অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে ও ধ্বংস করে। কোন ক্যাপসুল সৃষ্টি হতে পারে না। এই ক্ষমতাকে ইনভেসিভনেস বা অনুপ্রবেশ করার ক্ষমতা বলে।

(৩) মেটাসটেসিস

স্বল্প দৃষ্টগ্রাহী টিউমার আক্রান্ত অঙ্গে কেন্দ্রভূত থাকে, দেহের অন্যত্র ছড়াতে পারে না। পক্ষান্তরে দৃষ্টগ্রাহী টিউমার দেহের অন্যত্র ছড়াতে পারে।

মূল টিউমার হতে টিউমার কোষ স্খলিত হয়ে রক্ত বা লসিকা প্রবাহের মাধ্যমে অন্যান্য অঙ্গে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে দানাবাঁধে ও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে ও মূল টিউমার হিসাবে আচরণ করে।

যে পদ্ধতিতে মূল টিউমার হতে টিউমার কোষ অন্যত্র স্থানান্তরিত হয় তাকে মেটাসটেসিস বলে।

মূল টিউমারকে প্রাইমারী টিউমার বা প্রাথমিক টিউমার এবং স্থানান্তরিত টিউমারকে সেকেন্ডারী বা মাধ্যমিক টিউমার বলে।

মাধ্যমিক টিউমার প্রাথমিক টিউমারের ন্যায় আচরণ করে।

মেটাসটেসিসের পথ

যে সমস্ত পথে টিউমার কোষ স্থানান্তরিত হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো---

(ক) লসিকা প্রবাহ, (খ) রক্ত প্রবাহ, (গ) সেরাস গহ্বর, (ঘ) ফাঁপা অঙ্গের লসিকার মাধ্যমে যেমন ব্রংকাস, (ঙ) অন্যান্য পন্থা যেমন—অস্ত্রোপচারের সময় ছুরির সংস্পর্শে সরাসরি সংক্রমণ ইত্যাদি।

(ক) **লসিকা প্রবাহের মাধ্যমে**—এ পথেই সর্বাপেক্ষা বেশী হারে টিউমার মেটাসটেসিস সংঘটিত হয়ে থাকে, বিশেষ করে কারসিনোমা।

এ পথে মেটাসটেসিস দু'ভাবে ঘটে থাকে—

(অ) এমবোলাস দ্বারা—এমবোলাই হিসাবে টিউমার কোষ স্থানান্তরিত হতে পারে। এই পথই সর্বাপেক্ষা সাধারণ।

(আ) ভেদন দ্বারা (Permeation)—লসিকা নালী ভেদ ও সমাচ্ছন্ন করে টিউমার এগিয়ে যেতে পারে। এ পন্থায় মেটাসটেসিস খুব সাধারণ নয়। আক্রান্ত অঙ্গের সরবরাহকারী লসিকা গ্রন্থি সাধারণত আক্রান্ত হয়।

(খ) রক্তনালীর মাধ্যমে—সাধারণতঃ সারকোমা রক্ত প্রবাহের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়। কারসিনোমার ক্ষেত্রেও তা ঘটে কিন্তু কম হারে।

যে সমস্ত ক্ষেত্রে রক্ত প্রবাহের সাহায্যে কারসিনোমার স্থানান্তরণ ঘটে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—স্তন, প্রস্টেট গ্রন্থি, থাইরয়েড গ্রন্থি।

শিরার মাধ্যমেই সাধারণতঃ মেটাসটেসিস সংঘটিত হয়। ধমনীর সাহায্যে এ ঘটনা খুব বিরল। অঙ্গের মেটাসটেসিস আপন আপন রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। পোর্টাল রক্ত নালী যে সমস্ত অঙ্গে রক্ত সরবরাহ করে থাকে সে সমস্ত অঙ্গের টিউমার সাধারণতঃ যকৃতে স্থানান্তরিত হয়। অনুরূপ ভাবে যে সমস্ত অঙ্গ সিসটেমিক রক্ত প্রবাহ দ্বারা রক্ত সরবরাহ পেয়ে থাকে সে সমস্ত অঙ্গের টিউমার ফুসফুসে স্থানান্তরিত হয়।

(গ) সেরাস ক্যাভিটি—এ পন্থায় টিউমার স্থানান্তরিত হয় তবে তা খুব সাধারণ নয়। আক্রান্ত অঙ্গের সেরোসা স্তর আক্রান্ত হলে সে ক্ষেত্রে এ ঘটে থাকে।

টিউমার কোষসমূহ পেরিটোনিয়াল গহ্বরের মধ্য দিয়ে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে নিচে নেমে আসে ও রেট্রোপেরিটোনিয়ালের পেছনে ভ্যাজাইনাল ও ভেসিকেল পাউচএ উপনীত হয়ে মেটাসটেসিস সৃষ্টি করে। ক্রুকেনবার্গ টিউমার এর একটা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

(ঘ) ফাঁপা অঙ্গের নালিকা গহ্বরের মাধ্যমে—ফাঁপা অঙ্গের নালিকা গহ্বরের মধ্য দিয়েও টিউমার কোষ স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে যে বনকোজেনিক কারসিনোমা ব্রনকিউলের মধ্য দিয়ে, রেনালসেল কারসিনোমা ইউরেটারের মধ্য দিয়ে স্থানান্তরিত হয়।

(ঙ) অন্যান্য পথে—অন্যান্য উপায়েও দুষ্টগ্রাহী টিউমার স্থানান্তরিত হতে পারে। যেমন স্পাইনাল রস, নালিকার বিপরীত দিকের দেওয়ালের সংস্পর্শ, শল্য চিকিৎসকের ছুরি ইত্যাদির মাধ্যমে মেটাসটেসিস সংঘটিত হতে পারে।

(৪) কোষজনিত (Cytological) বৈশিষ্ট্য

দুষ্টগ্রাহী টিউমারে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে ঃ-

(অ) অবিভেদন, (Undifferentiation)

(আ) এনাপ্লেসিয়া বা আদি কোষান্তরণ,

(ই) বহুরূপী বা Pleomorphism,
(ঈ) সাইটোপ্লাজম কেন্দ্রক অনুপাত হার,
(উ) কেন্দ্রের পরিবর্তন,
(ঊ) মাইটোসিস।

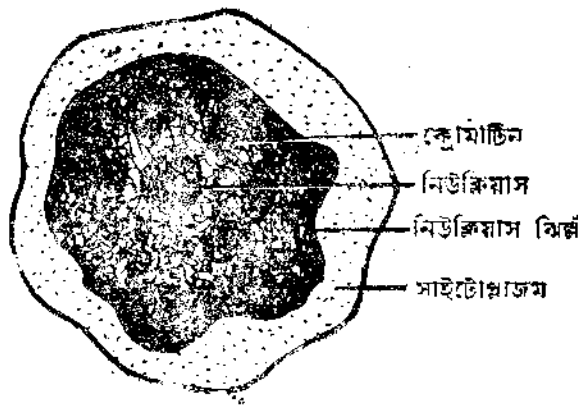

চিত্র নং ২৭

(অ) **অবিভেদন**—যে কলা হতে টিউমারের উৎপত্তি সে কলার সাথে সাদৃশ্য লোপ পাওয়াকে অবিভেদন বলে। অবিভেদন দুষ্টগ্রাহী কোষের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এটা এতদূর গড়াতে পারে যে কোন্ কলা হতে উত্থিত হয়েছে তা আর ধরা যায় না।

(আ) এনাপ্লেসিয়া বা আদিকোষ রূপান্তরণ—স্বাভাবিক অবস্থায় কলাস্থ বিভিন্ন কোষের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সুষমা বিদ্যমান থাকে। যেমন উপঝিল্লী কলাতে ব্যাসাল কোষসমূহ বেসমেন্ট ঝিল্লীর সাথে খাড়াখাড়িভাবে বিরাজ করে। তার উপর সারিতে প্রিকল কোষসমূহ 'একের উপরে এক' এভাবে বিদ্যমান থাকে। সর্বোপরি সুপারফিসিয়াল কোষসমূহ সমান্তরালভাবে ও আনুভূমিকভাবে বিদ্যমান থাকে।

এই স্বাভাবিক সুষমা নষ্ট হওয়াকে লস অব পোলারিটি অথবা সমবর্তিতা ক্ষয় বলা হয়। যখন এ অবস্থা গুরুতর রূপ ধারণ করে ও সমস্ত স্তর বিজড়িত হয় এবং যার ফলে কোন কলা তা আর চেনা যায় না তখন তাকে এনাপ্লেসিয়া বা আদি কোষ রূপান্তর বলে।

দুষ্টগ্রাহী টিউমারের কলা আদি কোষ রূপান্তরযুক্ত। বলা চলে এনাপ্লেসিয়া কলার দেখা দেওয়া গেলেই বলতে হবে যে কলাতে দুষ্টগ্রাহীতা বিদ্যমান।

(ই) **বহুরূপী** (pleomorphism)—দুষ্টগ্রাহী কোষ বড়, আকার-আকৃতিতে অসমান। প্রায় সব কোষই বড়, কিছু কিছু অপেক্ষাকৃত ছোট। কোষের আকার-আকৃতির অসমতাকে প্লিওমরফিজম বলে।

(ঈ) **সাইটোপ্লাজম (কেন্দ্রক আনুপাতিক হার)**—কেন্দ্রক আকারে বড় হওয়ায় কেন্দ্রক-সাইটোপ্লাজম হার পরিবর্তিত হয়।

(উ) **কেন্দ্রকের পরিবর্তন**—কেন্দ্রকের নিম্নলিখিত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়ঃ-

(ক) কেন্দ্রক আকারে বাড়ে, (খ) কেন্দ্রকের ঝিল্লি অসমান, (গ) ক্রোমাটিন দানাসমূহ স্থূল ও গুচ্ছবদ্ধ অবস্থায় বিরাজ করে, (ঘ) কেন্দ্রক গাঢ় রং ধারণ করে, (ঙ) কেন্দ্রিকা খুব লক্ষণীয়।

(ঊ) **মাইটোসিস**—দুষ্টগ্রাহী টিউমারে কোষের মাইটোসিসের হার খুব বেশী। পক্ষান্তরে স্বল্প-দুষ্টগ্রাহী টিউমারে এর হার কম। দুষ্টগ্রাহী টিউমারে অস্বাভাবিক মাইটোসিস পাওয়া যায়।

(৫) মৃত্যু

দুষ্টগ্রাহী টিউমারের রোগী সাধারণতঃ মারা যায়। পক্ষান্তরে স্বল্পদুষ্টগ্রাহী রোগীর টিউমারের কারণে মৃত্যু কদাচিৎ ঘটে। যদি তা ঘটে তবে তা টিউমারের জটিলতার জন্যই ঘটে। যেমন, মোচড় খাওয়া, রক্তপাত ইত্যাদি।

(৬) টিউমারের পুনরাক্রমণ

দুষ্টগ্রাহী টিউমার অপসারিত হলে পুনরায় দেখা দেয় কিন্তু স্বল্পদুষ্টগ্রাহী টিউমারের ক্ষেত্রে তা হয় না।

(৭) দেহশীর্ণতা (Cachexia)

দুষ্টগ্রাহী টিউমারে সাংঘাতিক রকমের দেহশীর্ণতা দেখা দেয়। এর কারণ হলো—

(ক) অপশোষণ (Malabsorbtion), (খ) প্রদাহ, (গ) রক্তপাত, (ঘ) অনাহার (starvation), (ঙ) টিউমারের প্রয়োজন মেটান, (চ) দুষ্টগ্রাহী কোষ দ্বারা নিঃসৃত এক প্রকার অভিবিষ।

টিউমারের ক্রমবিন্যাস

দুষ্টগ্রাহিতার মানের ভিত্তিতে দুষ্টগ্রাহী টিউমারদের নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় ঃ-

ক্রম-এক — সর্বাপেক্ষা কম দুষ্টগ্রাহী,

ক্রম-দুই — আরও বেশী দুষ্টগ্রাহী
ক্রম-তিন — ঐ
ক্রম-চার — সর্বাপেক্ষা দুষ্টগ্রাহী

এই ক্রম নির্ণয়ে নিম্নলিখিত নিয়ামকসমূহ ব্যবহার করা হয় :
(১) মাইটোসিসের সংখ্যা, (২) আদিকলা রূপান্তরের মাত্রা।

দুষ্টগ্রাহী টিউমারের প্রভাব—দুষ্টগ্রাহী টিউমার নিম্নলিখিত প্রভাব সৃষ্টি করে :

(১) দেহশীর্ণতা, — দুশ্চিন্তা, অনিদ্রা, প্রদাহ ইত্যাদির ফলে দেহ শীর্ণ হয়ে পড়ে,
(২) কোষ-পীড়িত,
(৩) চাপ সৃষ্টির ফলে উপসর্গ সৃষ্টি করা।
(৪) অঙ্গের বিনাশ সাধন,
(৫) রক্তপাত,
(৬) রক্তশূন্যতা,
(৭) ক্ষতসৃষ্টি,
(৮) ফিসটুলা গঠিত হওয়া,
(৯) হরমোনের সৃষ্টি।

স্বল্পগ্রাহী টিউমারের প্রভাব,—এরা তেমন কোন প্রভাব সৃষ্টি করে না। কখনও কখনও চাপ সৃষ্টিজনিত উপসর্গ, প্রতিবন্ধকতা ও দৃষ্টিকটুতা সৃষ্টি করে থাকে।

রোগ নির্ণয়

টিউমার নির্ণয়ের ব্যাপারে নিম্নলিখিত পন্থাসমূহ অবলম্বন করা হয় :

(ক) বায়োপসি—আণুবীক্ষণিকভাবে পরীক্ষা করার জন্য অস্ত্রোপচার করে জীবন্ত কলা সংগ্রহ করাকে বায়োপসি বলে। এ মূলতঃ তিন প্রকার :
(১) ইনসিশনাল—যখন শুধুমাত্র টিউমারের অংশ সংগ্রহ করা হয়,
(২) এক্সিশনাল—যখন সমগ্র টিউমার বের করা হয়,
(৩) নিডল—এক্ষেত্রে অঙ্গের অভ্যন্তরে সুচ ফুটিয়ে তার অংশ সংগ্রহ করা হয়। যকৃত, প্লীহা অস্থিমজ্জায় এ পন্থা নেওয়া হয়।

(খ) সাইটোলজিকাল—অঙ্গ হতে ঝরে পড়া কোষসমূহ সংগ্রহ করে পরীক্ষা দ্বারাও ক্যান্সার নির্ণয় করা যায়। জরায়ুর সারভিক্স, মূত্রাশয়, ফুসফুসের দুষ্টগ্রাহী টিউমারের ক্ষেত্রে এ পন্থার খুব প্রচলন আছে।

(গ) হরমোনের মাত্রা নিরূপণ---কোন কোন ক্ষেত্রে রক্তে হরমোনের মাত্রা নিরূপণ টিউমার নির্ণয়ে খুব উপকারে আসে। উদাহরণ: প্রস্টেট গ্রন্থি হতে অস্থিতে স্থানান্তরিত টিউমারে এসিড ফসফাটেস হরমোনের নিরূপণ; করিওকারসিনোমার ক্ষেত্রে প্রস্রাবে গোনাডোট্রপিক হরমোন পরিমাপ খুব কার্যকরী ফলদান করে।

চিকিৎসা

দুষ্টগ্রাহী টিউমারের চিকিৎসার ধারা নিম্নরূপ:

(১) শল্য চিকিৎসা, (২) রেডিও থেরাপি বা বিকিরণ চিকিৎসা,
(৩) কেমোথেরাপি বা কেমো চিকিৎসা, (৪) উভয়ের সংমিশ্রণ।

হেতুতত্ত্ব

দুষ্টগ্রাহী টিউমারের কারণ এখনও সঠিকভাবে ও সম্পূর্ণভাবে জানা যায় নি। বহু কারণের মিলিত প্রভাবেই এর উৎপত্তি। যে যে নিয়ামক টিউমারের পত্তন ঘটায় তাদের ইনিশিয়েটর বলে। কোন কোনটি এর বৃদ্ধি চালু রাখে। তাদের বলা হয় প্রমোটার। একই বস্তু প্রমোটার ও ইনিশিয়েটর উভয় হিসাবে কাজ করে।

এরা কোষের জিনে পরিবর্তন আনয়ন করে থাকে যাকে মিউটেশান বলে। এই পরিবর্তন উক্ত জিনে ঘটে, যে-কোষের বিজারকসমূহের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে কোষ বৃদ্ধি হ্রাস পায় ও আমিষ সংশ্লেষণ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে যা দাঁড়ায় তা হলো সীমাহীনভাবে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি।

টিউমারের উৎপত্তিতে বিভিন্ন নিয়ামকের প্রভাব

(১) জাতিগত ও ভৌগোলিক—জাপানী মহিলার চেয়ে আমেরিকান মহিলাদের স্তনের ক্যান্সার বেশী হয়। ইউরোপের চেয়ে প্রাচ্যদেশে যকৃতের ক্যান্সার বেশী হয়।

(২) লিঙ্গ--টিউমারের প্রাদুর্ভাবের উপর লিঙ্গের প্রভাব লক্ষণীয়। ফুসফুসের ক্যান্সার মেয়েদের চেয়ে পুরুষদের অনেক বেশী হয়। জীবনধারা ও হরমোনের পার্থক্যই এর কারণ বলে ধারণা করা হয়।

সাধারণভাবে বলতে গেলে বলা যায় জনন অঙ্গ বাদ দিলে মেয়েদের চেয়ে-পুরুষদের ক্যান্সার বেশী হয়।

(৩) বয়স-- সাধারণ দুষ্টগ্রাহী টিউমার বেশী বয়সের রোগ। কিন্তু কিছু কিছু টিউমার আছে যারা শৈশবকালেই ঘটে থাকে। যেমন: রেটিনো—ব্লাসটোমা।

ব্যাপ্তক গ্রন্থাগার, ঢাকা।
একসেশন নং ·৫৯.৫৯.........
তারিখ ২৯.৫.৮৯

কোন কোন টিউমার নবীন ও বৃদ্ধ উভয় বয়সেই দেখা যায়। যেমন লিমফোমা, লিউকেমিয়া ইত্যাদি।

(৪) **বংশগত** -- কোন কোন টিউমারের বংশগতভাবে সংঘটিত হবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন, নিউরোব্লাসটোমা, অন্ত্রের প্যাপিলোমা ইত্যাদি।

(৫) **ভৌতিক**--কোন কোন ভৌতিক বস্তুর প্রভাবও লক্ষণীয় ঃ

(ক) দীর্ঘস্থায়ী উত্তেজনা-- ভালভাবে না লাগা কৃত্রিম দাঁত, ধূমপান,

(খ) বারে বারে সংঘটিত আঘাত--অস্টিওজেনিক সারকোমা।

(গ) বিকিরণ--লিউকেমিয়া।

(৬) **রাসায়নিক দ্রব্য**-- এমন অনেক রাসায়নিক বস্তু আছে যাদের টিউমার উৎপাদনের ক্ষমতা আছে ঃ

(ক) এরোমেটিক পলিসাইক্লিক হাইড্রোকারবন--বেনজপাইরিন ১ ঃ ২৫৬ যেমন ডাইবেনজানথ্রাসিন

(খ) এজো কমপাউন্ড--বাটার ইয়েলো,

(গ) ক্ষার উৎপাদক বস্তু--নাইট্রোজেন মাস্টার্ড

(ঘ) এনিলিন রং

(ঙ) ধাতু--ক্রোমিয়াম, কোবাল্ট আরসেনিক, ইত্যাদি

(চ) হরমোন---এস্ট্রোজেন,

(ছ) নিকোটিন বা তামাক।

(৭) **জৈবিক** -- জৈবিক পদার্থের মধ্যে টিউমার উৎপাদনে ভাইরাসের ভূমিকা আছে বলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। মোরগ, পাখী ইত্যাদির ক্ষেত্রে এদের ক্যান্সার উৎপাদক ক্ষমতা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত উপমা দেওয়া যায় ঃ

(ক) প্যাপোভা ভাইরাস --(১) পলিওমা, (২) বোভাইন ওয়ার্ট, (৩) র‍্যাবিট, প্যাপোমা।

(খ) মিক্সোভাইরাস --(১) মাউস লিউকেমিয়া, (২) ফাউল লিউকোসিস।

(গ) পক্সভাইরাস,

(ঘ) এডিনো ভাইরাস।

ভাইরাস যে মানুষের ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে সে সম্বন্ধে এখনও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় নি। কিন্তু মহামারী-তাত্ত্বিক বা এপিডেমিওলজিক ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রমাণ এত বেশী পরিমাণে বিদ্যমান যে এর সম্ভাবনা সম্বন্ধে সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে।

হরমোন ও টিউমার

হরমোন ও টিউমারের সম্বন্ধ এখন অস্পষ্ট। কোন কোন টিউমার হরমোন দ্বারা সৃষ্টি হয় আবার কোন কোন ক্ষেত্রে টিউমারের স্থায়িত্ব হরমোনের উপর নির্ভরশীল। কোন কোন টিউমার হরমোন ক্ষরণ করে।

হরমোনের উপর নির্ভরশীল টিউমার—নিম্নলিখিত টিউমারসমূহ হরমোনের উপর নির্ভরশীল :

(১) প্রস্টেটগ্রন্থির ক্যান্সার—এনড্রোজেন, এসট্রোজেন
(২) স্তনের ক্যান্সার—প্রজেসট্রন, প্রোল্যাকটিন, এনড্রোজেন
(৩) থাইরয়েড গ্রন্থির ক্যান্সার—পিটিউটারী গ্রন্থির থাইরোট্রপিকহরমোন
(৪) এনডোমেট্রিয়াল কারসিনোমা—এসট্রোজেন।

টিউমার উৎপাদনে হরমোনের ভূমিকা—ল্যাবরেটরীতে ছোট পশুর অঙ্গে হরমোন প্রয়োগ করে টিউমার উৎপাদন করা সম্ভবপর হয়েছে। যদিও মানুষের ক্ষেত্রে তা হয়নি, তবে অল্প হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে, মানুষের দেহে টিউমার উৎপাদনে হরমোনএর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উপমা স্বরূপ নিম্নে কয়েকটী উল্লেখ করা হলো।

(ক) এনডোমেট্রিয়াল কারসিনোমা—এস্ট্রোজেন। গ্রানুলোসা সেল টিউমার যার থেকে প্রচুর পরিমাণ এস্ট্রোজেন ক্ষরিত হয়। এনডোমেট্রিয়াল কারসিনোমার সাথে সংঘটিত হতে দেখা যায়।
(খ) স্তনের কারসিনোমা—এস্ট্রোজেন
(গ) ভ্যাজাইনাল ক্লিয়ারসেল কারসিনোমা—এস্ট্রোজেন। গর্ভধারণের শেষ তিন মাসে যে মায়েরা ষ্টিলবস্ট্রারল সেবন করে থাকেন তাদের কন্যাদের এই টিউমার হতে দেখা যায়।
(ঘ) যকৃতের কারসিনোমা—এনড্রোজেনএর সাথে এর সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়।

দুষ্টগ্রাহী ও স্বল্পদুষ্টগ্রাহী টিউমারের তুলনা

বৈশিষ্ট্য	স্বল্পদুষ্টগ্রাহী	দুষ্টগ্রাহী
১। বৃদ্ধির হার	আস্তে আস্তে বাড়ে	দ্রুত বাড়ে
২। অনুপ্রবেশ	অনু প্রবেশ করে না	অনু প্রবেশ করে
৩। স্থানান্তরণ	হয় না	স্থানান্তরিত হয়
৪। ক্যাপসুল বা বহিরাবরণ	উপস্থিত থাকে	অনুপস্থিত।

বৈশিষ্ট্য	স্বল্প দুষ্টগ্রাহী	দুষ্টগ্রাহী
৫। কোষের বৈশিষ্ট্য	(ক) কোষসমূহ সুষম — আকারে ও আকৃতিতে সমতা বিদ্যমান	সুষম নয় আকার ও আকৃতিতে বৈচিত্র্য বিদ্যমান
	(খ) নিউক্লিয়াস স্বাভাবিক	নিউক্লিয়াসে অস্বাভাবিকতা বিদ্যমান
৬। মাইটোসিস	বিরল	সাধারণ
৭। রোগ ভবিষ্যৎ	রোগীর মৃত্যু হয় না	রোগীর মৃত্যু ঘটে
৮। পুনরাক্রমণ	অপসারণের পর পুনর্বার দেখা দেয় না	পুনরায় দেখা দেয়
৯। বিষাক্ততা	বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দেয় না	বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়।

কারসিনোমা ও সারকোমার তুলনা

বৈশিষ্ট্য	স্বল্প দুষ্টগ্রাহী	দুষ্টগ্রাহী
১। উৎপত্তির সূত্র	এপিথেলিয়াম বা উপঝিল্লী	সংযোজন কলা
২। স্থানান্তরণ	লসিকা ও রক্তপ্রবাহ দ্বারা	রক্ত প্রবাহ ও লসিকা প্রবাহ দ্বারা
৩। বিন্যাস	টিউমার কোষসমূহ এক গুচ্ছভাবে বিস্তার করে যা স্ট্রোমা বা ভিত্তিতন্তু দ্বারা বিভাজিত থাকে	কোষসমূহ বিস্তীর্ণভাবে ছড়িয়ে থাকে। কোষসমূহ এককভাবে ভিত্তিতন্তু দ্বারা বিভাজিত থাকে
৪। রক্ত প্রবাহ	রক্ত প্রবাহ কম	রক্তপ্রবাহ বেশী
৫। রোগ বিনষ্টি	অধিকতর লক্ষণীয়	কম লক্ষণীয়
৬। রক্তপাত	কম সাধারণ	সাধারণ

উল্লেখযোগ্য দুষ্টগ্রাহী টিউমারসমূহ

স্বল্প দুষ্টগ্রাহী উপঝিল্লী বা এপিথেলিয়াম কলার টিউমার-

প্যাপিলোমা ও এডিনোমাই হলো এপিথেলিয়ামের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

প্যাপিলোমা

চামড়া অথবা উপঝিল্লী হতে উত্থিত হয়ে বাইরের দিক বেরিয়ে থাকে এমন স্বল্প দুষ্টগ্রাহী টিউমারকে প্যাপিলোমা বলে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা বৃন্তযুক্ত এবং আঙ্গুল সদৃশ হয়ে থাকে। কিন্তু এরা বৃন্তহীনও হতে পারে। বৃন্তসমৃদ্ধ প্যাপিলোমাকে পলিপ বলে। সাধারণভাবে উপঝিল্লীর যে-কোন বৃন্তসম্পন্ন বস্তুকে তা সে টিউমারই হোক বা প্রদাহজনিত কারণেই হোক পলিপ বলা হয়।

আণুবীক্ষণিক চিত্র : মধ্যভাগে অবস্থিত অন্তর্বর্তী কলাসম্পন্ন ভিত্তিতন্তু ও তাকে আচ্ছাদন করে থাকা এপিথেলিয়াম বা উপঝিল্লী কলার সমন্বয়ে প্যাপিলোমা গঠিত। এই উপঝিল্লী স্কোয়ামাস, কলিউমনার বা ট্রানজিসনাল শ্রেণীভুক্ত হয়ে থাকে। এ স্তর হাইপারকেরাটোসিস ও একানথেটিক হতে পারে।

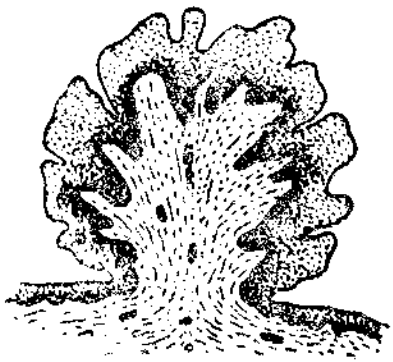

২৮ নং চিত্র : (স্কোয়াস প্যাপিলোমা)

কিন্তু কোষসমূহ আকারে ও আকৃতিতে সুষমাসম্পন্ন হয় ও বেসমেন্ট ঝিল্লীকে ভেদ করে না। মধ্যবর্তী কোর বা অংশে রক্ত প্রবাহ ও তন্তুপ্রাচুর্য বেশী।

প্যাপিলোমার উপরতল সংঘর্ষের সম্মুখীন হয় যার ফলে সেখানে ক্ষত ও প্রদাহ দেখা দিতে পারে।

শ্রেণীবিন্যাস : উপরতলের আচ্ছাদিত উপঝিল্লী-কোষেরা কোন্ শ্রেণীভুক্ত তার উপর ভিত্তি করে প্যাপিলোমাদের নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

(১) **স্কোয়ামাস প্যাপিলোমা ঃ** এ ক্ষেত্রে প্যাপিলোমা স্কোয়ামাস জাতীয় উপঝিল্লী দ্বারা গঠিত ও আচ্ছাদিত থাকে। উপঝিল্লী হাইপার কেরাটোটিক ও একানথেটিক হতে পারে।

এ শ্রেণীর প্যাপিলোমা চামড়া, মুখগহ্বর, ল্যারিংক্স ও স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম দ্বারা আচ্ছাদিত কলায় পাওয়া যায়।

(২) **ট্রানজিশনাল প্যাপিলোমা ঃ** এ ক্ষেত্রে উপরতল ট্রানজিশনাল এপিথেলিয়াম দ্বারা গঠিত ও আচ্ছাদিত থাকে।

মূত্রাশয়ই সর্বাপেক্ষা সাধারণ স্থান যেখান হতে এ ধরনের প্যাপিলোমা উত্থিত হয়। সাধারণতঃ এরা সংখ্যায় একাধিক এবং এদের বৃন্ত লম্বা ও আঙ্গুল সদৃশ হয়। যার ফলে এদের মখমলের ন্যায় দেখায়।

(৩) **কলিউমনার সেল প্যাপিলোমা ঃ** এ ক্ষেত্রে উপরতল কলিউমনার কোষ দ্বারা গঠিত ও আচ্ছাদিত থাকে। উল্লেখযোগ্য স্থান যেখানে এ ধরনের প্যাপিলোমা পাওয়া যায় তারা হলো—অন্ত্র, পাকস্থলী, মূত্রাশয়, জরায়ুর ঝিল্লীস্তর, সারভিক্সের জলকোষের দেওয়াল।

সাধারণতঃ এরা বৃন্তসম্পন্ন ও লম্বা সূক্ষ্ম আঙ্গুল সদৃশ সূতার সমন্বয়ে গঠিত। অনেক সময় এদের পলিপ বলে। এরা স্বরূপ দুষ্টগ্রাহী যদিও কখনও কখনও দুষ্টগ্রাহিতায় রূপান্তরিত হতে পারে।

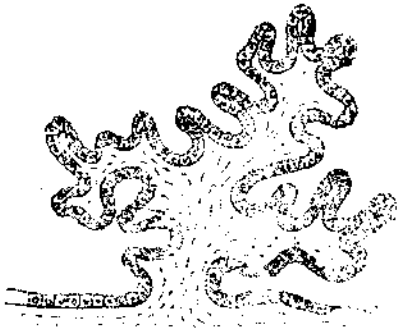

চিত্র নং ২৯ ঃ (এডিনোমা)

এডিনোমা

গ্রন্থির এপিথেলিয়াম হতে যে সমস্ত স্বরূপ দুষ্টগ্রাহী টিউমার উত্থিত হয় তাদের এডিনোমা বলে।

আক্রান্ত স্থানসমূহ ঃ যদিও এরা যে-কোন গ্রন্থি হতে উঠতে পারে তবে

সাধারণতঃ যে সমস্ত অঙ্গ আক্রান্ত হয় তারা হলো—স্তন, প্রস্টেট গ্রন্থি, থাইরয়েড অণ্ড, ঘর্ম গ্রন্থি ও অন্তস্রাবী গ্রন্থিসমূহ।

খালি চোখে দৃশ্যমান চিত্র ঃ সাধারণতঃ এরা সুনির্দিষ্টভাবে সীমাবদ্ধ গুটিকা আকারে বিদ্যমান। চতুষ্পার্শ্বে এক বহিরাবরণ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। কখনো কখনো বৃন্তও উপস্থিত থাকতে পারে।

আণুবীক্ষণিক চিত্র ঃ কলিউমনার অথবা কিউবয়েডকোষের সমন্বয়ে এরা গঠিত। কোষসমূহ গ্রন্থি ও টিউবিউলের আকারে বিরাজ করে। বিভিন্ন মাত্রায় বিরাজমান তন্তুকলা দ্বারা এই কোষসমূহ পরিবেষ্টিত থাকে। যখন এই তন্তু-কলার সংখ্যা বেশী হয় তখন তাদের ফাইব্রোএডিনোমা বলে।

যখন গ্রন্থির ক্ষরণের মাত্রা বেশী হয় ও তা বাইরে বের হতে না পারে তখন জলকোষ আকারে পুঞ্জীভূত হয়। তখন তাদের সিসট এডিনোমা বলে।

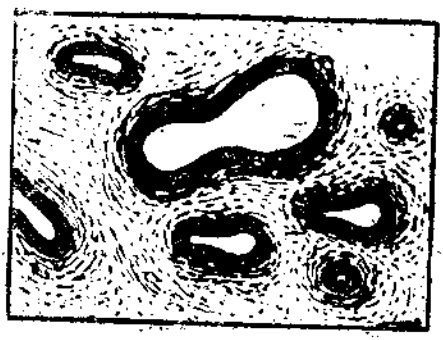

চিত্র নং ২৯—ক : (ফাইব্রোএডিনোমা)

টিউমার কোষের কার্যক্ষমতা অটুট থাকে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় যে ধরনের ক্ষরণ সৃষ্টি করে এখানেও তাই হয়। যেমন থাইরয়েড গ্রন্থির ক্ষেত্রে থাইরোক্সিন ক্ষরিত হয়। যকৃতের ক্ষেত্রে পিত্ত।

এই কোষসমূহের সাথে স্বাভাবিক কোষের অপূর্ব মিল থাকে এবং স্বাভাবিক হতে টিউমারকে তফাৎ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

উপঝিল্লী কোষের দুষ্টগ্রাহী টিউমার—কারসিনোমা

কারসিনোমাকে প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(১) উপরতলের উপঝিলী হতে উত্থিত—

(ক) স্কোয়ামাস সেল কারসিনোমা,

(খ) ট্রানজিসনালসেল কারসিনোমা,

(গ) ব্যাসাল সেল কারসিনোমা।

(২) গ্রন্থিস্থ উপঝিল্লী হতে উত্থিত—এডিনো কারসিনোমা।

স্কোয়ামাস সেল কারসিনোমা

এরা স্কোয়ামাস সেল হতে উত্থিত হয়।

আক্রান্ত স্থান : স্কোয়ামাস উপঝিল্লী দ্বারা আচ্ছাদিত যেকোন স্থান হতে এরা উত্থিত হতে পারে।

কলিউমনার কোষ দ্বারা আচ্ছাদিত যেকোন অঙ্গ থেকেও এ টিউমার সৃষ্টি হতে পারে। কলা রূপান্তরণের ফলে কলিউমনার কোষসমূহ স্কোয়ামাস কোষে রূপান্তরিত হলে সেখান থেকে এই টিউমারের উৎপত্তি।

যে সমস্ত অঙ্গ এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য তা হল—মুখগহ্বর, ফ্যারিংক্স, ব্রনকাস, চামড়া, জরায়ুর সারভিক্স, ইউরেটার, বুকের পেলভিস, এসোফেগাস, পিত্তথলি, নাকের সাইনাস, ক্ষতের কিনারা।

খালি চোখে দৃশ্যমান অবয়ব : স্কোয়ামাস সেল কারসিনোমা নিম্ন লিখিত যে-কোন রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে :

(ক) পীড়কা বা ফুলকপি সদৃশ—অসমতল উপরতল বিশিষ্ট এবড়ো থেবড়ো পীড়কা আকারে টিউমার দেখা দিতে পারে,

(খ) গন্ডিকাকার—গন্ডিকা আকারে বিরাজ করে,

(গ) ক্ষতময়—উপরোক্ত দু'শ্রেণীর টিউমারে ক্ষত দেখা দেয়।

আণুবীক্ষণিক চিত্র : দৃষ্টগ্রাহী স্কোয়ামাস কোষের সমন্বয়ে এই টিউমার গঠিত। কোষসমূহ বিস্তীর্ণ স্তম্ভ, পাত বা পূর্ণবর্ত (whorl) আকারে বিরাজ করে। এরা প্রচুর তন্তু কলা দ্বারা বিভাজিত থাকে। কোষসমূহ আকার ও আকৃতিতে একে অপর হতে ভিন্ন। কেন্দ্রকসমূহ বৃহৎ ও হাইপারক্রোমাটিক। কেন্দ্রিকাসমূহ লক্ষণীয়ভাবে চোখে পড়ে। মাইটোসিসের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অস্বাভাবিক মাইটোসিসও দেখা যায়। বেসমেন্ট বা মেমব্রেন ভিত্তি-ঝিল্লী অটুট থাকে না এ পার্শ্ববর্তী কলাসমূহে অনুপ্রবেশ করে। এককভাবে ও মিলিতভাবে কোষসমূহে করনিফিকেশন ঘটে যার ফলে কোষসমূহ কাঠামোবিহীন লালচে বস্তুতে পরিণত হয়। এদের কেরাটিন বলে। বহিরস্থ কোষসমূহ সমকেন্দ্রকভাবে অবস্থিত। এদের 'এপিথেলিয়াল পার্ল' বা সেল-নেস্ট বলে। বহু কোষের অভ্যন্তরে দানাদার বস্তু বিদ্যমান থাকে।

কয়েকটি আণুবীক্ষণিক উপশ্রেণী দেখা যায় যেমন—

ভেরুকাস কারসিনোমা, স্পিনডাল কারসিনোমা, স্কোয়ামাস সেল কারসিনোমা।

ক্রমবিন্যাস নির্ধারণ

টিউমারের বিভেদনের ভিত্তিতে টিউমারদের চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। চামড়ার অসুখের অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

স্থানান্তরণ : স্কোয়ামাস সেল কারসিনোমা নিম্নলিখিত পন্থায় অন্যত্র স্থানান্তরিত হয় :

(১) স্থানীয়ভাবে অনুপ্রবেশ, (২) লসিকা প্রবাহের মাধ্যমে, (৩) রক্ত প্রবাহের মাধ্যমে।

লসিকা গ্রন্থি ও বিভিন্ন অঙ্গে এরা স্থানান্তরিত হতে পারে।

ট্রানজিশনাল সেল কারসিনোমা

ট্রানজিশনাল কোষ হতে যে দুষ্টগ্রাহী টিউমার উত্থিত হয় তাদের ট্রানজিশনাল সেল কারসিনোমা বলে। এই শ্রেণীভুক্ত এপিথেলিয়াম দ্বারা আচ্ছাদিত অঙ্গ হতে এরা উৎপন্ন হয় যেমন মূত্রাশয়, ইউরেটার ইত্যাদি।

খালি চোখে দৃশ্যমান এ শ্রেণীর টিউমারের অবয়ব স্কোয়ামাস সেল কারসিনোমার অবয়বের মত। আণুবীক্ষণিকভাবে এই শ্রেণীভুক্ত টিউমার ট্রানজিশনাল কোষের সমন্বয়ে গঠিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই টিউমার বিভেদিত থাকে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এরা অত্যন্ত অবিভেদিত। মাইটোসিসের সংখ্যা প্রচুর।

স্বল্প দুষ্টগ্রাহী টিউমার প্যাপিলোমা হতে এই শ্রেণীর দুষ্টগ্রাহী টিউমার দেখা দিতে পারে।

এডিনো কারসিনোমা

গ্রন্থির উপঝিল্লী কোষ হতে যারা উত্থিত হয় তাকে এডিনো কারসিনোমা বলে।

আক্রান্ত অঙ্গ—যে সমস্ত অঙ্গ হতে এডিনো কারসিনোমা উদ্ভব হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র, পিত্তথলি, থাইরয়েড গ্রন্থি, স্তন, বৃক্ক, জরায়ু ইত্যাদি।

খালি চোখে দৃশ্যমান অবয়ব—খালি চোখে দেখলে এডিনো কারসিনোমাদের নিম্নলিখিত রূপে পাওয়া যায় :

(১) গন্ডিকা আকার,

(২) ফুলকপি সাদৃশ্য,

(৩) ক্ষতময়,

(৪) আংটির মত বা অঙ্গুরীয়াকার—এ ক্ষেত্রে ফাঁপা অঙ্গের দেওয়াল আংটির মত দৃঢ় হয়। যেমন, অন্ত্র।

আণুবীক্ষণিক চিত্র—গ্রন্থি অথবা গ্রন্থিনালীর সমন্বয়ে এডিনোকারসিনোমা গঠিত হয়। এরা সংখ্যায় ও আকারে ছোট, বড় ও এলোপাতাড়িভাবে বিরাজ করে। এরা কলিউমনার বা কিউবয়েড কোষ দ্বারা সীমায়িত থাকে। কোষসমূহের মধ্যে দৃষ্টগ্রাহিতার বৈশিষ্ট্য হিসাবে যেমন এদের আকার ও আকৃতিতে একে অপর হতে স্বতন্ত্র কেন্দ্রক, আকারে বড় এবং কেন্দ্রিকাও খুব লক্ষণীয়ভাবে দৃশ্যমান হয়ে উঠে। কখন কখন কোষসমূহ বিস্তীর্ণভাবে বিরাজ করে। স্পষ্টভাবে গ্রন্থি সৃষ্টি না করলেও গ্রন্থি তৈরী করার প্রচেষ্টা চলছে তা বোঝা যায়।

চিত্র ৩০ঃ কারসিনোমা

এই সমস্ত গ্রন্থি সামান্য অথবা প্রচুর পরিমাণ তন্তুকলা দ্বারা বিভাজিত থাকে। কোষসমূহ হতে প্রচুর পরিমাণে ক্ষরণ নির্গত হতে পারে।

আণুবীক্ষণিক চিত্রের ভিত্তিতে এডিনোকারসিনোমাকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ঃ

(১) **কলিউমনার সেল শ্রেণীভুক্ত**—এ ক্ষেত্রে টিউমার-এর কোষসমূহ কলিউমনার শ্রেণীভুক্ত।

(২) **প্যাপিলারী কারসিনোমা**—এ ক্ষেত্রে পিড়কা বা প্যাপিলারী আকারে বিরাজ করতে দেখা যায়।

(৩) **সিসট এডিনোকারসিনোমা**—এ ক্ষেত্রে টিউমারে জলকোষ দেখা যায়। যেমন ডিম্বাশয়ের সিসট এডিনোকারসিনোমা।

(৪) **মিউকয়েডকারসিনোমা**—এ ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে মিউকাস বা শ্লেষ্মা সৃষ্টি হয়। যেমন অন্ত্রের কারসিনোমা স্তন, ব্রনকাসের কারসিনোমা ইত্যাদি। মিউকাসের ফলে কেন্দ্রক কোষের কিনারায় ঠেলে পড়ে। ফলে মোহরযুক্ত আংটি বা **signet ring**-এর রূপ ধারণ করে।

(৫) **সিরাস কারসিনোমা**—এ ক্ষেত্রে টিউমার কোষ ছোট ছোট গুচ্ছ আকারে বিরাজ করে ও প্রচুর পরিমাণ তন্তু দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে।

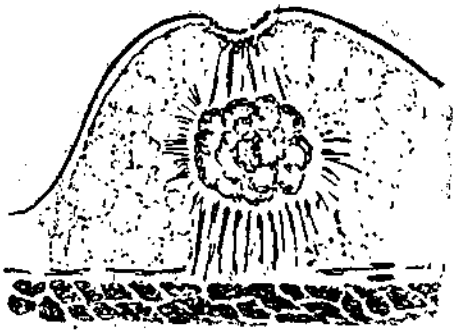

চিত্র ৩১ঃ কারসিনোমা

(৬) **মেডুলারী কারসিনোমা**—এ ক্ষেত্রে তন্তুকলার পরিমাণ নগণ্য; সমস্ত টিউমারেই কোষ বিস্তীর্ণভাবে বিরাজ করে।

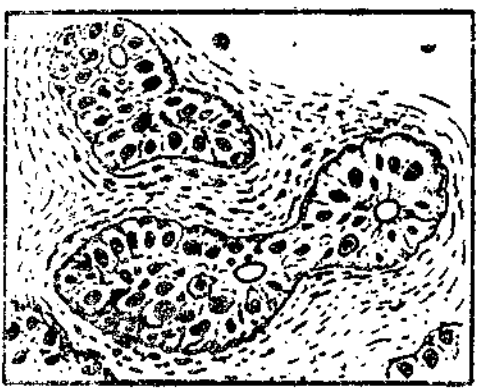

চিত্র ৩২ঃ কারসিনোমা

(৭) **কারসিনোমা সিমপ্লেক্স**—এখানে শুধু কোষ বিদ্যমান কিন্তু তারা কোন প্রকার গ্রন্থি সৃষ্টি করে না।

স্থানান্তরণ—এডিনোকারসিনোমা নিম্নলিখিত উপায়ে দেহের অন্যত্র স্থানান্তরিত হয় ঃ

(১) স্থানীয়ভাবে অনুপ্রবেশ, (২) লসিকা প্রবাহ মাধ্যমে,
(৩) রক্তপ্রবাহ মাধ্যমে, (৪) অঙ্গের নালীকা মাধ্যমে।

এনাপ্লাসটিক কারসিনোমা বা অবিভেদিত কারসিনোমা—যখন স্কোয়ামাসসেল কারসিনোমা, ট্রানজিশনাল সেল কারসিনোমা অথবা এডিনো-কারসিনোমা এত বেশী অবিভেদিত হয় যে তারা কোন্ শ্রেণীর কলা হতে উৎপন্ন হয়েছে তা আর বোঝা যায় না তখন তাদের অবিভেদিত কারসিনোমা বলে।

এদের দুষ্টগ্রাহীতার মাত্রা বেশী এবং সহজেই অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়ে পড়ে।

যদিও তারা বিকিরণ রশ্মির প্রতি সংবেদনশীল, এদের রোগভবিষৎ খুব অন্ধকার।

সংযোজন কলার টিউমার

ফাইব্রোমা

তন্তুকলা বা ফাইব্রাস কলা হতে যে টিউমার সৃষ্টি হয় তাকে ফাইব্রোমা বলে।

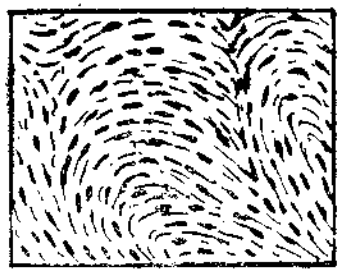

চিত্র ৩৩ ঃ ফাইব্রোমা

আক্রান্ত স্থান—এদের নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া যায় ঃ

চামড়া, মাংসপেশীর ফ্যাসা, Sub Cutaneous কলা এবং বিভিন্ন কলা যেমন ডিম্বাশয়, স্তন, বৃক্ক ও অন্ত্র।

শ্রেণী বিভাগ—এদের প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়

(১) **দৃঢ় ফাইব্রোমা**—এক্ষেত্রে টিউমার কোষের মাত্রা খুব কম ও তন্তু প্রাচুর্য অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

(২) **নরম ফাইব্রোমা**—এক্ষেত্রে কোষের মাত্রা বেশী ও তন্তুপ্রাচুর্যের সংখ্যা নগণ্য।

খালি চোখে দৃশ্যমান অবয়ব—এরা আকারে বড় বা ছোট এবং আকৃতিতে গোল বা ডিম্বাকার হতে পারে, এরা সুস্পষ্ট ভাগে সীমাবদ্ধ, বহিরাবরণ দ্বারা পরিবেষ্টিত। এরা দৃঢ়, শক্ত অথবা রবার সুলভ এবং এদের রং সাদা, কর্তিত তল চকচকে যার মাঝে মাঝে তন্তুকলার রেখা দেখতে পাওয়া যায়।

অণুবীক্ষণিক চিত্র—টাকু সাদৃশ্য ফাইব্রোব্লাস্ট এবং ফাইব্রোসাই কোষের সমন্বয়ে এই টিউমার গঠিত। প্রচুর পরিমাণ তন্তু বিদ্যমান যা ঢেউ খেলান রশ্মিগুচ্ছ হিসাবে বিরাজ করে। যা একের সাথে আর এক জড়ান থাকে। বোনা থাকে। বহিরাবরণ খুব স্পষ্টভাবে।

ডেসময়েড টিউমার

বিশেষ এক ধরনের ফাইব্রোমা যা রেকটাস এবডোমিনিস মাংসপেশীর সিথ হতে উঠে। এর বহিরাবরণ থাকে না, ফলে এরা পার্শ্ববর্তী কলাসমূহে অনুপ্রবেশ করে। অপসারিত হবার পরে পুনরায় জন্মায়। কিন্তু দুষ্টগ্রাহিতা বা সারকোমাসুলভ কোন লক্ষণ দেখা যায় না। গর্ভবতী মেয়েদের মধ্যে এ টিউমার দেখা যায়। সম্পূর্ণরূপে অপসারণ না করলে পুনরায় দেখা দিতে পারে।

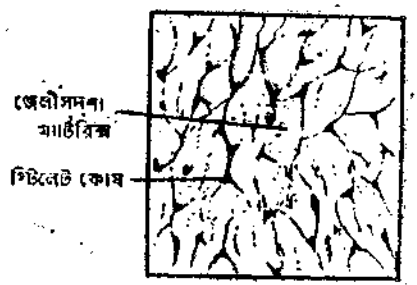

চিত্র ৩৪ ঃ মিক্সোমা

মিক্সোমা

এ এক ধরনের টিউমার যা এমন ফাইব্রোব্লাসটিক কলা হতে উঠে এবং যা কোলাজেন উৎপন্ন করতে সক্ষম নয় কিন্তু মিউকোপলিস্যাকারাইড উৎপন্ন করতে সক্ষম। আদিম ম্যাসেনকাইম হতেও এর উৎপত্তি হতে পারে। এ শ্রেণীর টিউমার বিরল।

সাধারণভাবে যে সমস্ত স্থানে পাওয়া যায়—অধস্তকীয় কলা, মাংসপেশী

ফ্যাসা, চোয়াল, হৃৎপিণ্ড। কম হলেও হাড়ে, ক্ষুদ্রান্ত্রে, পাকস্থলীতে, পেরিটোনিয়ামের পশ্চাৎভাগে এদের পাওয়া যায়।

খালি চোখে দৃশ্যমান অবয়ব—এরা আকারে ছোট হতে পারে আবার বড় ও হতে পারে। আকৃতিতে গোল অথবা ডিম্বাকার। এরা নরম, ফ্যাকাশে ধূসর ও স্বচ্ছ, দেখতে জেলীর ন্যায়। কিনারা খুব সুস্পষ্ট নয় কর্তিত তল চকচকে ও হড়হড়ে।

আণুবীক্ষনিক চিত্র—তারকাসাদৃশ্য ভ্রূণজাত সংযোজন কলার কোষ সমন্বয়ে এ টিউমার গঠিত। কোষসমূহ মিউকাসসুলভ ভিত্তিকলা দ্বারা বিভাজিত থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তখন কোলাজেন অথবা ঘন ফাইব্রাস কলা পাওয়া যায়। একবার অপসারিত হবার পর এ পুনরায় দেখা দেয়।

যে সমস্ত সারকোমাতে মিক্সোমাসুলভ পরিবর্তন দেখা যায় তাদের মিক্সো-সারকোমা বলে।

লাইপোমা

পরিপূর্ণভাবে গঠিত চর্বিকোষ হতে যে স্বল্পদৃষ্টগ্রাহী টিউমার উঠে তাকে লাইপোমা বলে। এদের চর্বি কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হতে পার্থক্য করা প্রয়োজন।

এই টিউমার সাধারণতঃ পূর্ণ বয়স্কদের মধ্যে পাওয়া যায়।

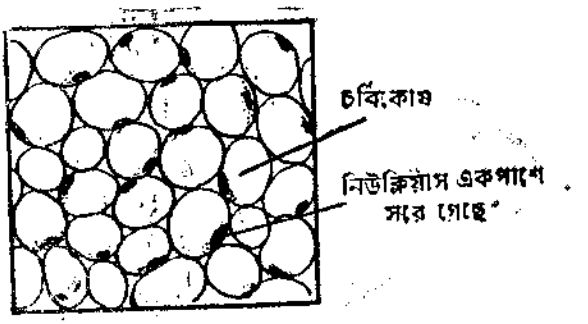

চিত্র ৩৫: লাইপোমা

আক্রান্ত স্থানসমূহ—এই টিউমারে যে সমস্ত স্থান সাধারণতঃ আক্রান্ত হয় তারা হলো পিঠের অধস্তকীয় কলা, ঘাড়, কাঁধ, পাছা, পেরিটোনিয়ামের পিছনে অবস্থিত চর্বি, মেসেন্ট্রি ও অন্যান্য অঙ্গ।

খালি চোখে দৃশ্যমান অবয়ব—এরা আকারে বড় বা ছোট, নরম, অস্পষ্টভাবে হলেও বহিরাবরণ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে যাকে খুব সহজেই ছাড়ান যায়। এরা দেখতে হলদে এবং ওপরতল লোবাইল সম্পন্ন।

আণুবীক্ষণিক চিত্র—পূর্ণভাবে গঠিত চর্বিকোষ-এর সমন্বয়ে এই টিউমার গঠিত। এই কোষসমূহের আকার স্বাভাবিকের চেয়ে বড়। কোষসমূহকে বিভাজিত করে যে অন্তর্বর্তী কলা তার মাত্রা খুব সামান্য। বহিরাবরণ দ্বারা পার্শ্ববর্তী কলা হতে এরা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে।

লিওমায়োমা

লিওমায়োমা মসৃণ-পেশী কোষ হতে উৎপন্ন স্বল্পদুষ্টগ্রাহী টিউমার। দেহের যে অঙ্গে মসৃন পেশী বিদ্যমান সে স্থান হতে এরা উত্থিত হতে পারে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা যেখানে বেশী পাওয়া যায় তা হলো জরায়ুর মাংসপেশী স্তর। ত্রিশবয়ষোর্ধ মহিলাদের শতকরা তিরিশ ভাগ ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর টিউমার পাওয়া যায়। অন্যান্য যে সমস্ত অঙ্গে এদের পাওয়া যায় তারা হলো পাকস্থলী অন্ত্রের দেওয়াল।

এরা নিরেট, শক্ত ও কঠিন, সুনির্দিষ্টভাবে সীমায়িত এবং বহিরাবরণ দ্বারা পরিবেষ্টিত। কর্তিত তল শামুক খোলের চক্রপাকের মত দেখায়। আণুবীক্ষণিকভাবে এরা টাকু-সাদৃশ্য মাংসপেশী-কোষএর সমন্বয়ে গঠিত। কোষসমূহ বান্ডিলের আকারে বিভিন্ন দিকে প্রসারিত অবস্থায় বিরাজিত। কোষসমূহের আকার ও আকৃতিতে সুষমা থাকে। মাইটোসিসের সংখ্যা বিরল।

র‍্যাবডোমায়োমা

রেখায়িত মাংস-পেশী হতে উদ্ভূত স্বল্পদুষ্টগ্রাহী টিউমারকে র‍্যাবডোমায়োমা বলে। এরা অত্যন্ত বিরল।

সারকোমা

সংযোজক কলা হতে উত্থিত দুষ্টগ্রাহী টিউমারকে সারকোমা বলে। এরা বিভিন্ন শ্রেণীর হয়ে থাকে। এরা কোন শ্রেণীর কলা হতে উত্থিত তার ভিত্তিতে এদের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। যেমন ফাইব্রাস কলা হতে উঠলে ফাইব্রোসারকোমা, অস্থিকলা হতে উঠলে অষ্টিওসারকোমা ইত্যাদি।

খালি চোখে দৃশ্যমান অবয়ব এবং আণুবীক্ষণিক চিত্র বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন [illegible] নির্ভর করে কোন্ শ্রেণীর কলা হতে এদের উৎপত্তি। কিন্তু কতকগুলি [illegible] সবক্ষেত্রেই উপস্থিত। নিচে তা বর্ণনা করা হলো।

খালি চোখে দৃশ্যমান অবয়ব—সাধারণভাবে বলতে গেলে বলা চলে যে, সারকোমা আকারে বড়, দৃঢ়তায় নরম এবং দেখতে মাংসের মত। কর্তিততল সমসত্ত্ব-সম্পন্ন। কোষ-পচিতি, মিক্সোমেটাসসুলভ ডিজেনারেশন, রক্তপাতযুক্ত এলাকা প্রায়ই নজরে পড়ে।

আণুবীক্ষণিক চিত্র—সারকোমা কারসিনোমার চেয়ে অধিক কোষ সমৃদ্ধ কোষসমূহ সমরূপী ও বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এককভাবে বিরাজ করে। সাধারণ ভিত্তিকলা দ্বারা বিভাজিত নয়। প্রচুর রক্তনালী বিদ্যমান থাকে। মাইটোসিসের সংখ্যা প্রচুর। টিউমার কোষের কিনারা সুনির্দিষ্ট নয় টিউমারকোষ কি ধরনের তা নির্ভর করে কোন্ শ্রেণীর টিউমার তার উপর।

সম্প্রসারণ—সারকোমা নিম্নলিখিতভাবে দেহের অন্যত্র ছড়ায়।

(১) স্থানীয় অনুপ্রবেশ,

(২) অন্যত্র—স্থানান্তরণ, বা মেটাসটেসিস—

(ক) রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে, (খ) নালিকা প্রবাহের মাধ্যমে—কম সাধারণ।

শ্রেণীবিভাগ

কোন্ কলা হতে উত্থিত হয় তার উপর অথবা কোন্ শ্রেণীর কোষের দ্বারা এরা গঠিত তার উপর ভিত্তি করে সারকোমাদের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। যেমন র‍্যাবডোমায়োসারকোমা, রাউন্ডসেলসারকোমা, স্পিনডেলসেল সারকেমা ইত্যাদি।

ফাইব্রোসারকোমা

ফাইব্রোমা যেমন ফাইব্রাস কলার স্বল্পদুষ্টগ্রাহী টিউমার, ফাইব্রোসার-কোমা তেমনি ফাইব্রাস কলার দুষ্টগ্রাহী টিউমার।

যে সমস্ত অঙ্গ আক্রান্ত হয়—মাংসপেশীর অন্তর্বর্তী স্থানের ফ্যাসা হতে এরা উত্থিত হয়। তা সে দেহের যে-কোন স্থান হতে পারে। তবে হাত, পা বিশেষ করে নিম্নাঙ্গ হতেই এরা বেশী উঠে থাকে।

খালি চোখে দৃশ্যমান অবয়ব—এরা গোলাকার লোবিয়ুলযুক্ত পিন্ড হিসাবে দেখা দেয় যা খুব নরম ও ভঙ্গুর। কিনারা খুব অস্পষ্ট। কর্তিত তল মাংসল। কোষ পচিতি, রক্তপাতযুক্ত ও মিক্সোমাসুলভ এলাকা পরিদৃষ্ট হয়।

আণুবীক্ষণিক চিত্র—দুষ্টগ্রাহীতার লক্ষণযুক্ত ফাইব্রোসাইট কোষের সমন্বয়ে এই টিউমার গঠিত। যে সমস্ত টিউমার অপেক্ষাকৃত কম অভিবেদিত

সে সমস্ত ক্ষেত্রে কোষসমূহ আকারে ও আকৃতিতে সুষমাসম্পন্ন। ফাইব্রোমা হতে তাদের পৃথক করা দুষ্কর। পক্ষান্তরে যে সমস্ত টিউমার অধিক মাত্রায় দুষ্টগ্রাহী তাদের ক্ষেত্রে টিউমার কোষসমূহ আকারে ও আকৃতিতে অসম ও তারা এনাপ্লাসটিক ও বহুরূপী। মাইটোসিসের সংখ্যা প্রচুর। প্রচুর পরিমাণ দৈত্য কোষ ও অস্বাভাবিক আকৃতির কোষ বিদ্যমান। মিক্সোম্যাসুলভ ডিজেনারেশন চোখে পড়ে। কোষের কাঠামোর বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ফাইব্রো সারকোমাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যখন

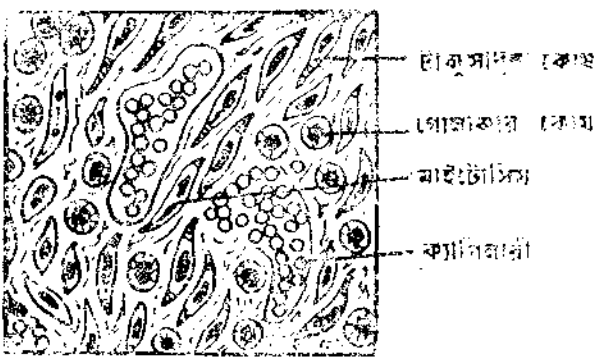

চিত্র ৩৬: ফাইব্রোসারকোমা

কোষসমূহ গোলাকার বা ডিম্বাকৃতি হয় তখন তাদের রাউণ্ডসেল সারকোমা বলা হয়। যখন তাদের আকৃতি টাকুর মত হয় তখন টিউমারকে স্পিনডেল সেল কারসিনোমা বলা হয়। এরা দ্রুত বাড়তে থাকে এবং সত্বর দেহের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। রোগ ভবিষ্যৎও খুব অন্ধকারাচ্ছন্ন।

মাইটোসিসের প্রাচুর্য, বেশী মাত্রায় দৈত্য কোষের উপস্থিতি ও তন্তুর অপ্রতুলতা বিদ্যমান থাকলে টিউমার যে অধিকতর দুষ্টগ্রাহী হয় তা বোঝা যায়। ফাইব্রোম্যাটোসিস বা সিউডোসারকোমাটোসিস ফ্যাসাইটিস নামক এক স্বল্প-দুষ্টগ্রাহী অবস্থা হতে এদের পৃথকীকরণ করা একান্ত প্রয়োজন।

লিওমায়োসারকোমা

কখনও কখনও লিওমায়োমা দুষ্টগ্রাহীতায় রূপান্তরিত হয়। তখন তাকে লিওমায়োসারকোমা বলে। এর প্রাদুর্ভাব খুব বিরল। এ ক্ষেত্রে টিউমারের কোষসমূহ হাইপ্রোমাটিক এবং মাইটোসিসের সংখ্যা প্রচুর।

লাইপোসারকোমা

ভ্রূণজাত চর্বি কোষ হতে যে সমস্ত টিউমার উৎপন্ন হয় তাদের লাইপো-সারকোমা বলে।

আক্রান্ত স্থানসমূহ—সর্বাপেক্ষা বেশী হারে যে সমস্ত অঙ্গ আক্রান্ত হয় তারা হলো পাছা, নিম্নাঙ্গ ও পেরিটোনিয়ামের পশ্চাৎভাগের কলা।

অণুবীক্ষণিক চিত্র—দানাদার কোষসমূহের সমন্বয়ে এই টিউমার গঠিত। এ সমস্ত কোষের কেন্দ্রকসমূহের এলোমেলো Bizerre ও কিম্ভূত কিমাকার

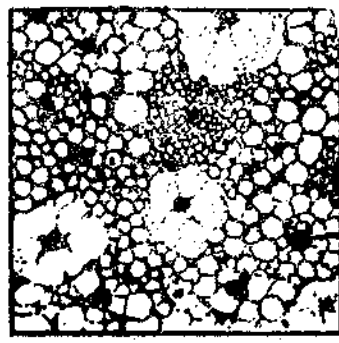

চিত্র ৩৭: লাইপোসারকোমা

কেন্দ্রিকা বিদ্যমান থাকে। এদের সাইটোপ্লাজমে বহুসংখ্যক বিন্দিকা থাকে ফলে ফেনার মত দেখায়। ভিত্তিকলা মিক্সোমাসুলভ এবং তাতে প্রচুর পরিমাণ রক্তনালী বিদ্যমান থাকে। দৈত্য কোষ উপস্থিত থাকে। মাইটোসিসের উপস্থিতি অধিক। পার্শ্ববর্তী কলাতে অনুপ্রবেশ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

টেরাটোমা

টেরাটোমা বলতে এমন টিউমার বোঝায় যেখানে আদিম ব্লাসটোডারমস্থ তিন স্তরের যেকোন দু'টোর উপাদান উপস্থিত থাকতে দেখা যায় এবং যা স্বাভাবিক অবস্থায় উক্ত কলায় বিদ্যমান থাকে না। জার্ম-কলার টোটিপোটেন্ট কোষ হতে উৎপন্ন হয়। একটোডারম, এনডোডারম, মেসোডারম দ্বারা গঠিত অঙ্গ বা অঙ্গ সদৃশ কলা দৃষ্ট হয়। এই শ্রেণীর দুই বা তিন শ্রেণীর কলা যেমন দাঁত, হাড়, ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে। জার্ম কোষ যা পরিপূর্ণ কলায় বিভেদিত হতে অসমর্থ হয় তা 'ফিটাল রেন্ট' হিসাবে দেহের বিভিন্ন অংশে অবস্থান করে। এরাই টেরাটোমা সৃষ্টির উৎস।

টেরাটোমা স্বল্পদুষ্টগ্রাহী অথবা দুষ্টগ্রাহী দুই প্রকারেরই হতে পারে। বাল্যকাল অথবা পূর্ণ বয়সে এরা উৎপন্ন হয়।

আক্রান্ত স্থান—টেরাটোমা সর্বাপেক্ষা বেশী হারে দেখা দেয় গোনার্ড বা জনন অঙ্গে যেমন ডিম্বাশয়, শুক্রাশয়। স্যাকরোকক্সিজিয়াল এলাকা পেরিটোনিয়ামের পশ্চাৎভাগ, খুলির মেঝেতেও এদের পাওয়া যায়।

খালি চোখে দৃশ্যমান অবয়ব—টেরাটোমা জলকোষ কখনও কখনও আংশিক জলকোষী ও আংশিক নিরেট রূপে দেখা দেয়। জলকোষের অরিয় সেরাম জাতীয় পদার্থ। এ টিউমারের দেওয়ালে চুল, দাঁত, হাড় ইত্যাদি উপস্থিত থাকতে পারে।

আণুবীক্ষণিক চিত্র—সাধারণতঃ বহু জলকোষ বিদ্যমান থাকে যা স্কোয়া জাতীয় উপঝিল্লী দ্বারা রেখায়িত থাকে। কখনও কখনও স্তম্ভাকার বা কলুমনার কোষ দ্বারাও রেখায়িত হতে পারে। দেওয়ালে বিভিন্ন অঙ্গের উপাদান যেমন উপাস্থি, অস্থি, সেবেসিয়াস গ্রন্থি ইত্যাদি দেখা যায়।

চিত্র ৩৮ ঃ টেরাটোমা

দুই বা ততোধিক উপাদানে দুষ্টগ্রাহিতার লক্ষণ যেমন এনাপ্লেসিয়া ইত্যাদি বিদ্যমান থাকলে টিউমারকে দুষ্টগ্রাহী টেরাটোমা বলে গণ্য করা হয়।

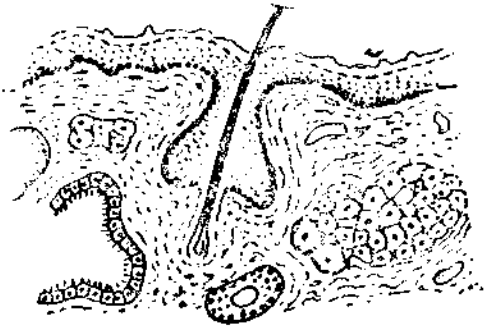

চিত্র ৩৯ ঃ ডারময়েডসিস্ট

স্থানান্তরণ—দুষ্টগ্রাহী টেরাটোমা দ্রুত ও অধিক মাত্রায় দেহের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে।

প্রিক্যান্সার অথবা দুষ্টগ্রাহীর পূর্বাবস্থা

এমন কিছু অবস্থা আছে যাদের দুষ্টগ্রাহী টিউমারের পূর্ব অবস্থা বলে বিবেচনা করা হয়। দীর্ঘদিন স্থায়ী বিদ্যমান থাকলে এরা দুষ্টগ্রাহী টিউমারে রূপান্তরিত হয় কয়েকটি উপমা নিচে দেওয়া হলো—

সেনাইল কেরাটোসিস, সোলার বা একটোনিক কেরাটোসিস, লিউকোপ্লাকিয়া ক্ষুদ্রান্ত্রের পলিপ, বোয়েনেস অসুখ, মূত্রাশয়ের প্যাপিলোমা, সারভাইকাল ইরোশন, সিসটোসো, প্যাজেটএর অসুখ, মিয়াসিস, ডিসপ্লেসিয়া, ক্রনের অসুখ, আলসারেটিভ কোলাইটিস, গ্যাস্ট্রিক আলসার।

***

৫

ভাসকুলার ডিজঅর্ডার

থ্রমবোসিস

রক্তনালীর মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হওয়া অবস্থায় যে পদ্ধতি দ্বারা রক্ত জম বাঁধে তাকে থ্রমবোসিস বলে। জমাট বাঁধা রক্ত থ্রমবাস নামে পরিচিত।

থ্রমবোসিস ও কোয়াগুলেশনের মধ্যে তফাৎ

থ্রমবোসিস ও কোয়াগুলেশনের মধ্যে মূল তফাৎ এদের সৃষ্টির পদ্ধতিতে। মূলতঃ থ্রমবাস সৃষ্টি হয়, রক্তনালীর ইনটিমা স্তরের উপরে অনুচক্রিকার তলানী পড়ার ফলে। পক্ষান্তরে কোয়াগুলেশনের সৃষ্টি রাসায়নিক পদ্ধতির মাধ্যমে ফিবরিনোজেন হতে ফিবরিন সৃষ্টি হওয়ার ফলে।

এই দুই পদ্ধতি সহঅবস্থান করতে পারে। কারণ কোয়াগুলেশনের জন্য যে থ্রমবোপ্লাসটিনের প্রয়োজন হয় তা তলানী পড়া অনুচক্রিকা হতেই নিঃসৃত হয়। যদি প্রবাহমান রক্তের গতি তীব্র হয় তবে থ্রমবাস আক্রান্ত স্থানে স্থির থাকতে পারে না। ফলে থ্রমবোপ্লাসটিনও সহজলভ্য (available) হয় না ফলে কোয়াগুলেশন সৃষ্টি হতে পারে না।

গঠনের প্রক্রিয়া

থ্রমবোসিস-প্রক্রিয়ার প্রথম পরিবর্তন যা চোখে পড়ে তা হোল অনুচক্রিক পরস্পর ও ইনটিমার গায়ে অধিক মাত্রায় লেগে যায়। এ ছাড়া অনুচক্রিকাসমূহ এককভাবে না থেকে গুচ্ছে বিরাজ করে। এর ফলে এরা ইনটিমার উপরে তলানী হিসাবে জমা হয়। পরবর্তীকালে অনুচক্রিকার তলানী পড়ার ব্যাখ্যা নিম্নলিখিতভাবে দেওয়া যায়।

রক্তনালী আঘাত পাওয়ার ফলে আঘাতপ্রাপ্ত কোষে এ, টি, পি বিশ্লেষিত হয় যার ফলে প্রচুর পরিমাণে এ, ডি, পি, নির্গত হয়। এ ডি পি অনুচক্রিকার গুচ্ছ বন্ধনে সাহায্য করে। এছাড়া বৈদ্যুতিক চার্জ পরিবর্তনও এ ব্যাপারে

উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। সাধারণতঃ ইনটিমার বৈদ্যুতিক চার্জ নেতিবাচক যেমনটি অনুচক্রিকার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এর ফলে উভয়ে উভয়কে বিকর্ষণ করে ও অণুচক্রিকা ইনটিমা হতে দূরে রাখে। কিন্তু ইনটিমা আঘাত প্রাপ্ত হলে তার বৈদ্যুতিক চার্জ হাঁ-বাচক হয়ে পড়ে যার ফলে অনুচক্রিকা আকর্ষিত হয় এবং তলানি হিসাবে তারা ইনটিমার দিকে আকর্ষিত হয় ও তার উপর তলে তলানি পড়ে।

অণুচক্রিকা রক্ত-নালীর উপর তলানি পড়ে তুষারের মত বিছিয়ে থাকে। রক্তনালীর এবড়ো থেবড়ো স্থানসমূহ পূর্ণ ও সমতল হয়ে পড়ে। অতঃপর আরও অনুচক্রিকা তলানি পড়তে থাকে যার ফলে শৈল্য শিখরের মত খাড়া-ভাবে বিরাজ করে। এদের শৈবালের মত দেখায় কিনারাসমূহ জলঢেউএর

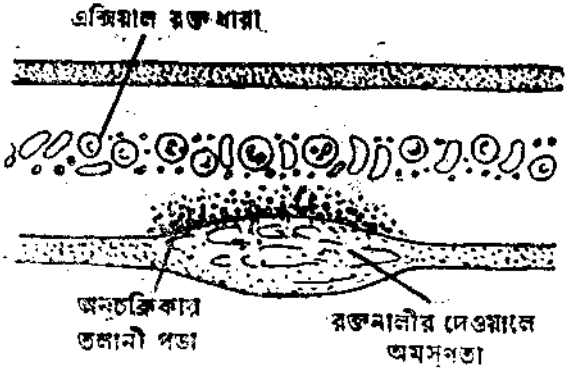

চিত্র ৪০ঃ থ্রমবোসিস

মত। এদের জান এর (Zohn) রেখা বলে। এই সমস্ত অনুচক্রিকার সমষ্টি ফ্যাকাশে ধরনের হয়ে থাকে এবং এদের 'পেল থ্রমবোসিস' বলে। অনুচক্রিকা-সমূহ হতে থ্রমবোপ্লাসটিন নিসৃত হয় যার ফলে কোয়াগুলেশন পদ্ধতির শুরু হয়। ফলে ফিবরিনোজেন হতে ফিবরিন সৃষ্টি হয়। এদের সূতিকার ন্যায় দেখায়। এই সমস্ত সূতিকা সাদৃশ্য বস্তু দুই শৈল্য শিখরে শীর্ষস্থান হতে ঝুলে থাকে। এইভাবে মাকড়শার জালের মত সৃষ্টি হয়। যেখানে শ্বেতকণিকা ও লোহিত কণিকাসমূহ আটকে পড়ে। থ্রমবাস লাল রং ধারণ করে। এদের রেড বা লাল থ্রমবাস নামে অভিহিত হয়।

রক্তনালীর অভ্যন্তর যখন সম্পূর্ণরূপে মজে যায় তখন রক্তপ্রবাহ সম্পূর্ণ-রূপে বন্ধ হয়ে পড়ে। অনুচক্রিকা অনুপস্থিত থাকার ফলে আর থ্রমবাস সৃষ্টি হতে পারে না। পক্ষান্তরে কোয়াগুলেশন চলতেই থাকে। সৃষ্ট ক্লট বা রক্ত জমাটকে প্রপগেটেড ক্লট বলে। একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, রক্তনালী

সর্বক্ষণ মৃদু আঘাতের সম্মুখীন হয়ে থাকে কিন্তু অনুচক্রিকা সেই ক্ষতস্থানে জমা হয়ে রক্তপাত বন্ধ করে। অতিশীঘ্র এনডোথেলিয়াম কোষ দ্বারা ক্ষতস্থান আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে সম্ভাব্য থ্রমবাস সৃষ্টি বন্ধ হয়।

চিত্র ৪১ থ্রমবাস

যে সমস্ত নিয়ামক ক্লট বা রক্তজমাট বন্ধ করতে সাহায্য করে তারা হলো—

(১) থ্রমবিন নিরোধক দ্রব্যাদি

(২) ফিবরিন বিনাশক পদ্ধতি

(৩) এনডোথেলিয়াম কোষের দ্রুত সৃষ্টি।

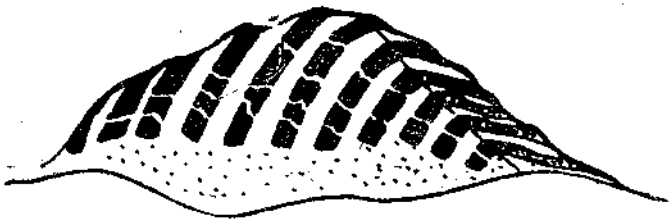

চিত্র ৪২ ঃ জানের লাইন

শ্রেণীবিভাগ

(১) রংএর ভিত্তিতে থ্রমবাস তিন প্রকার ঃ

(ক) ফ্যাকাশে বা পেল থ্রমবাস—এ ক্ষেত্রে থ্রমবাস কেবলমাত্র অনুক্রিকা দ্বারা গঠিত হয়।

(খ) লাল বা রেড থ্রমবাস—এ ক্ষেত্রে থ্রমবাস প্রধানতঃ তঞ্চিত রক্ত বা ক্লট দ্বারা গঠিত,

(গ) মিশ্র—এ ক্ষেত্রে উপরোক্ত দুই প্রকার থ্রমবাস উপস্থিত থাকে।

(২) আক্রান্ত স্থানের ভিত্তিতে

(ক) মিউরাল—এ ক্ষেত্রে থ্রমবাস শুধুমাত্র দেওয়ালের গায়ে লেগে থাকে এবং নালিকা গহ্বর বন্ধ হয় না।

(খ) অবরোধক—এ ক্ষেত্রে নালিকা সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ হয়ে থাকে।

(গ) বল-থ্রমবাস—হৃৎপিন্ডের বাম দিকের অলিন্দে গোলাকার থ্রমবাস লেগে থাকা অবস্থায় বিরাজ করে। এর ফলে মাঝে মাঝে ভালভের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়।

(ঘ) সম্প্রসারণশীল থ্রমবাস—অবরোধক থ্রমবাস আরও বড় হতে থাকে এবং রক্তনালীর প্রবাহ পথে লম্বা এক থ্রমবাস আকারে তা বিরাজ করে, একে সম্প্রসারণশীল থ্রমবাস বলে।

(৩) **প্রদাহের উপস্থিতির ওপর ভিত্তি** করে থ্রমবাসকে নিম্নলিখিত ভাগ করা চলে—

(ক) সেপটিক থ্রমবাস—থ্রমবাসে প্রদাহ দেখা দেয়,

(খ) ব্লান্ড থ্রমবাস—থ্রমবাস এ ক্ষেত্রে জীবাণুমুক্ত থাকে।

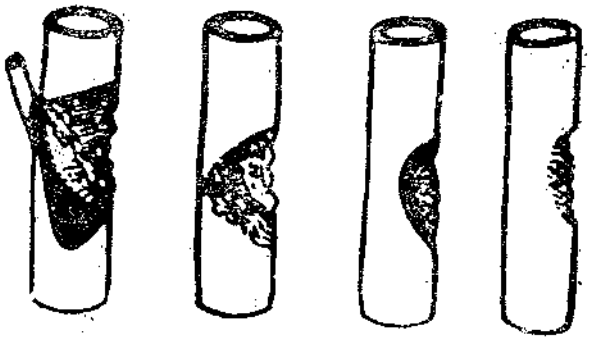

চিত্র ৪৩ : থ্রমবাস গঠনের পর্যায়

কারণ

স্বাভাবিক অবস্থায় রক্ত প্রবাহমান থাকে। যে, সমস্ত নিয়ামকের উপর এ নির্ভরশীল তাতে গোলযোগ দেখা দিলে থ্রমবোসিসের সৃষ্টি হয়। যে সমস্ত কারণে এই গোলযোগের সৃষ্টি হয় এবং থ্রমবোসিসের উৎপন্ন হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :-

(১) রক্ত প্রবাহের নিশ্চলতা,

(২) রক্তনালীর খুঁত,

(৩) রক্তের উপাদানের পরিবর্তন।

(ক) **রক্ত প্রবাহের নিশ্চলতা**—এ এক গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। রক্তের

প্রবাহ স্তিমিত হলে অনুচক্রিকাসমূহ তলানি হিসাবে পড়ে। শিরাতে রক্তের প্রবাহ কম তীব্র হওয়ার ফলে শিরাতে থ্রমবসিস বেশী সৃষ্টি হয়।

যে সমস্ত অবস্থায় রক্ত প্রবাহ শ্লথ হয় এবং থ্রমবাস গঠনে সহায়ক হয় তাদের মধ্যে অন্যতম হলো—

(১) অস্ত্রো পচায়ের পর,

(২) বৃদ্ধ অবস্থায় হৃৎপিন্ডের কমজোর হওয়া.
(৩) শয্যায় শায়িত থাকার ফলে রক্তচলাচলে বিঘ্নতা,
(৪) কনজেসটিভ হার্ট ফেলিওর বা হৃৎপিন্ডের বিফলতা
(৫) শকের জন্য এবং পেট ফোলার ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসের বিঘ্নতা।,

(খ) **রক্তনালীর খুঁত**—থ্রমবাস গঠনের ব্যাপারে রক্তনালীর এনডোথেলিয়ামের খুঁত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। এনডোথেলিয়াম আঘাতপ্রাপ্ত হলে অমসৃণ হয় ও তা থ্রমবাস গঠনের ভিত্তিস্থান হিসাবে কাজ করে। আঘাতের ফলে বৈদ্যুতিক চার্জেরও পরিবর্তন দেখা যায়; ফলে স্বাভাবিকের চেয়ে কম মাত্রায় অনুচক্রিকার বিকর্ষণ ঘটে।

যে সমস্ত কারণে এনডোথেলিয়াম আঘাত প্রাপ্ত হয় তারা হলো :—

(১) এথেরোমা-জনিত পরিবর্তন

(২) কোষ-পচিতি--বিভিন্ন কারণে রক্তনালীতে কোষ-পচিতি দেখা দেয়। যেমন পেরিআরটেরাইটিস নার্ভোসা, লিউপাস এরিথোমাটোসাস, ম্যালিগন্যান্ট জাতীয় উচ্চ রক্তচাপ, ফ্লেবাইটিস ইত্যাদি।

(৩) আঘাত--যেমন শৈল্য চিকিৎসকদের ছুরি, তোষকের চাপ ইত্যাদি।

(গ) **রক্ত সৃষ্টির উপাদান**, রক্তের বিভিন্ন উপাদান এই-বিষয়ে ভূমিকা রাখে-যার প্রমাণ হোল যে, উপরোল্লিখিত নিয়ামকসমূহ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে থ্রমবোসিস হয় না অথচ অনেক ক্ষেত্রে তা ঘটে থাকে।

উপাদানে যে সমস্ত পরিবর্তন দেখা দেয় তারা হলো :-

(১) অনুচক্রিকা-অনুচক্রিকা সমূহ আঠালো হয়ে উঠে। এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এবং সহজে বিনষ্ট হয়।

(২) লোহিত কণিকা-লোহিত কণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে।

এদের গুচ্ছবদ্ধতা হয়ে পড়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে রক্তের সান্দ্রতা (**viscosity**) বেড়ে যায়। এবং খুব সহজেই বিনষ্ট হয়।

(৩) প্লাজমা—প্লাজমা উপাদানের পরিবর্তন ঘটে। ফিবরিনের মাত্রা বৃদ্ধি পায় ও হেপারিনের উৎপাদন বেড়ে যায়।

থ্রমবাস গঠনের স্থান

থ্রমবাস নিম্নলিখিত স্থানে সৃষ্টি হয়ে থাকে ঃ

(১) শিরা, (২) ধমনী, (৩) হৃৎপিণ্ড।

১। শিরা

শিরাই থ্রমবাস গঠনের সর্বাপেক্ষা সাধারণ স্থান। এর কারণ এরা দেহের অগভীর স্থানে বিরাজিত হওয়ার ফলে সহজে আঘাতপ্রাপ্ত হয় ও প্রদাহের শিকার হয়। এছাড়া এদের দেওয়ালে স্থিতিস্থাপকশীল তন্তুর পরিমাণ কম থাকায় ও সরু হওয়ায় এরা সহজে আঘাতপ্রাপ্ত হয়।

আক্রান্ত শিরাসমূহ—যে সমস্ত শিরাতে সাধারণত থ্রমবাস গঠিত হয় তারা হলো পায়ের কফে মাংসপেশীর শিরা, ক্যাভারনাস সাইনাস, বগলের শিরা বা এক্সিলারী ভেন ইত্যাদি।

শিরার থ্রমবোসিস দু'প্রকার হয়ে থাকে ঃ

(১) ভেনাস থ্রমবোসিস

(২) থ্রমবোসিস ফ্লেবাইটিস।

(১) **ভেনাস থ্রমবোসিস**—এ অবস্থা সাধারণ রক্তপ্রবাহ ব্যর্থতা, শ্বাস-প্রশ্বাসের গণ্ডগোল ও আঘাতের সাথে জড়িত।

সৃষ্ট থ্রমবাস নরম, টিলা এবং অকোলাস রূপী হয়ে থাকে। সহজেই এরা বিচ্যুত হয় ও পালমোনারী এমবোলিজম সৃষ্টি করে।

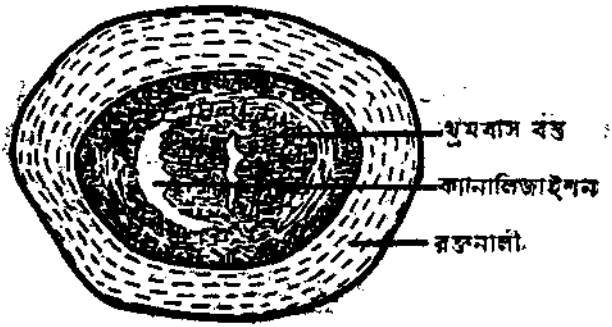

চিত্র ৪৪ঃ ক্যানালাইজেশন

এই অবস্থা অস্ত্রোপচারের পরবর্তী জটিলতা হিসাবে দেখা দিতে পারে। কারণ এই শিরা সহজেই চুপসে যায়, সামনাসামনিভাবে দু'দিকের দেওয়াল ঘর্ষিত হয় যার ফলে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। এর ফলে থ্রমবোসিসের শুরু হয়।

(২) **থ্রমবো ফ্লেবাইটিস**—এ দুই প্রকারের ঃ

(ক) সেপটিক থ্রমবোফ্লেবাইটিস,

(খ) সিম্পল থ্রমবোফ্লেবাইটিস।

(ক) **সেপটিক থ্রমবো ফ্লেবাইটিস**—বীজাণুজাত প্রদাহের ফলেই এর সৃষ্টি। এনটিবায়োটিক আবিষ্কারের পর এর প্রকোপের হার খুব নেমে গেছে। যদিও ক্যাভারনাস সাইনাস ও পেলভিক ভেন থ্রমবোসিস এখনো পাওয়া যায়।

ক্যাভারনাস সাইনাস থ্রমবোসিস সাধারণতঃ মুখমণ্ডলের প্রদাহে ও সূতিকা জ্বর বা পারিপিউরাল ফিভারে সংঘটিত হয়।

থ্রমবাস রক্তনালীর গায়ে লেগে থাকে যার ফলে পালমোনারী এমবোলিজমের সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে। থ্রমবোসারের অংশবিশেষ বিচ্যুত হয়ে এমবোলাস সৃষ্টি করতে পারে বা ফুসফুসে পেঁাছে। বিভিন্ন স্থানে কোথ-পচিতি ঘটাতে পারে।

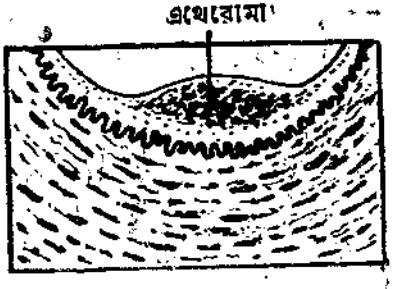

চিত্র ৪৫ ঃ এথেরোমা।

(খ) **সিম্পল থ্রমবোফ্লেবাইটিস**—এ ক্ষেত্রে থ্রমবিসের সাথে রক্তনালীর প্রদাহ বিদ্যমান থাকে যাতে জীবাণু দেখা যেতে পারে বা নাও পারে।

থ্রমবাস দেওয়ালে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকে যার ফলে পালমোনারী এম-বোলিজমের আশঙ্কা থাকে না বললেই চলে। উপমা—ফ্লেগমাসিয়া সেরুলী, ফ্লেগমাসিয়া ডোলেনস, ফ্লেগমাসিয়া এলবা ডোলেন্স।

২। ধমনী

ধমনীতে থ্রমবাস গঠনে সাধারণের চেয়ে স্থানীয়ভাবে বিরাজমান নিয়ামক-সমূহ যেমন, রক্তনালীর ক্ষত, অধিকতর ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। এতদ্‌সংক্রান্ত

নিয়ামকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— (১) আঘাত, (২) প্রদাহ যেমন— জায়ন্ট সেল আরটেরাইটিস, বায়জারের অসুখ ইত্যাদি, (৩) ধমনী কাঠিন্য, (৪) এথেরোস্ক্লেরোসিস, (৫) টিউমার ইত্যাদি।

এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলো এথেরোস্ক্লেরোসিস। এথেরোস্ক্লেরোসিসের ফলে রক্তনালীর দেওয়াল খসখসে হয়ে পড়ে যেখানে থ্রমবোসিস গঠনের সূত্রপাত ঘটে। এর পরে যা উল্লেখযোগ্য তা হলো কোষ-পচিতি জনিত রোগ যেমন ধমনীর প্রদাহ।

আক্রান্ত স্থান—সর্বাপেক্ষা সাধারণ আক্রান্ত স্থানসমূহ— (১) করোনারী ধমনী, (২) সেরেব্রাল ধমনী, (৩) নিম্নাঙ্গের ধমনী।

৩। **হৃৎপিণ্ড**

হৃৎপিন্ডের তিনটি স্থানে থ্রমবোসিস সৃষ্টি হতে পারে ঃ

(ক) ভালভের খসখসে স্থান—এনডোকারডাইটিস।

(খ) মায়োকারডিয়াল ইনফারকশনের নিম্নস্থ এনডোকারডিয়ামে।

(গ) বাম দিককার অলিন্দে—মাইটাল স্টেনোসিসে এ পাওয়া যায়। এরা বিচ্যুত হয়ে এমবোলাস হিসাবে দেহের বিভিন্ন অংশে পৌঁছাতে পারে।

পরিণতি

আকার, অবস্থান, প্রদাহ বিদ্যমান কিনা তার উপর থ্রমবোসিসের পরিণতি নির্ভর করে। এর উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত যেকোন পরিণতি সৃষ্টি হতে পারে ঃ

(১) শোষণ ও সম্পূর্ণ সেরে উঠা—থ্রমবাসের আকার যদি ক্ষুদ্র হয় তবে তা শোষিত ও সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়।

(২) পুঁজাক্তি সৃষ্টি—সাথে প্রদাহ উপস্থিত থাকলে পুঁজাক্তির সৃষ্টি হতে পারে।

(৩) অর্গানাইজেশন—দীর্ঘদিনব্যাপী উপস্থিত থাকলে থ্রমবাস তন্তুয়িত হয় যেমন ঘটে কলাতে রক্তপাতের ক্ষেত্রে। ফাইব্রোব্লাস্ট ও ক্যাপিলারীর সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। রক্তনালীর দেওয়াল হতে উৎপন্ন হয়ে এরা ভেতরের থ্রমবাসের দিকে অগ্রসর হয় ও আচ্ছন্ন করে, যার ফলে তা তন্তুকলায় পরিণত হয়।

(৪) সংকোচন ও নালিকার সৃষ্টি—ফিবরিন উপস্থিত থাকায় তন্তুয়িত থ্রমবাস সংকুচিত হয় বার ফলে সেখানে ফাটলের সৃষ্টি হয়। এই ফাটলের কিনারা এনডোথেলিয়াম দ্বারা আচ্ছাদিত হয় এবং এভাবে

নতুন রক্তপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। এ পন্থাকে ক্যানালাইজেশন বলে।
(৫) ফেবোলিথ—কোন কোন ক্ষেত্রে ক্যালসিয়াম লবণের তলানি পড়ে।

থ্রমবাসের প্রভাব

নিম্নলিখিত নিয়ামকের উপর থ্রমবাসের প্রভাব নির্ভর করে :

(১) আক্রান্ত রক্তনালীর আকার যত বড় হবে এর প্রভাবও তত গুরুতর হবে।
(২) আক্রান্ত অঙ্গ—অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ যেমন হৃৎপিন্ড, চক্ষু, মস্তিষ্ক ইত্যাদির ক্ষেত্রে এর প্রভাব গুরুতর।
(৩) কোলেটারাল রক্তপ্রবাহের অবস্থা—যদি কোলেটারাল রক্তপ্রবাহ খুব সমৃদ্ধ হয় তবে এর প্রভাব তেমন চোখে পড়ে না। পক্ষান্তরে, কোলেটারাল রক্তপ্রবাহ ক্ষীণ হলে ইনফারকশন বা কলাপচিতি ঘটে।
(৪) কত দ্রুত ঘটে তার উপর—দ্রুত সংঘটিত থ্রমবাস ধীরে ধীরে সংঘটিত থ্রমবাস অপেক্ষা অধিকতর বিপজ্জনক। কারণ, এ ক্ষেত্রে কোলেটারাল রক্তপ্রবাহ অবস্থা সামলে ওঠার সময় পায় না।

জটিলতা

থ্রমবোসিসের ফলে নিম্নলিখিত জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে :

(১) ইনফারকশন—থ্রমবাসের ফলে বিভিন্ন অঙ্গে ইনফারকশন সৃষ্টি হতে পারে। হৃৎপিন্ডে, মগজে এ ঘটলে গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। রেটিনাল ধমনীতে থ্রমবোসিস দেখা দিলে রোগী অন্ধ হয়ে যেতে পারে।
(২) এমবোলাস—থ্রমবাস আক্রান্ত স্থান হতে বিচ্যুত হয়ে দেহের অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়ে এমবোলাস হিসাবে এমবোলিজম সৃষ্টি করতে পারে।
(৩) পানিবদ্ধতা (oedema)—শিরায় গঠিত থ্রমবাস রক্ত প্রত্যাবর্তনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ফলে পানিবদ্ধতার সৃষ্টি হতে পারে।
(৪) ক্ষতসৃষ্টি—পায়ের গোছার মাংসের গভীরে অবস্থিত শিরায় ক্যানালাইজেশন সৃষ্টি হলে উক্ত শিরায় রক্ত চাপ বৃদ্ধি পায় বিশেষ করে হাঁটার সময়। এর ফলে প্রতিবন্ধকতার পরবর্তী অংশে ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে।
(৫) গাংগ্রীন—ধমনীস্থ থ্রমবোসিসের ক্ষেত্রে কোলেটারাল রক্তপ্রবাহ ক্ষীণ হলে প্রতিবন্ধকের পরবর্তী কলাতে গাংগ্রীন দেখা দিতে পারে। উদাহরণ, মেসেন্ট্রিক ধমনীর থ্রমবোসিসের ক্ষেত্রে অন্ত্রের কোষপচিতি।

(৬) প্রদাহ—থ্রমবাস প্রদাহ দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। স্থানচ্যুত প্রদাহযুক্ত থ্রমবাস সেপটিক ইনফারকশন ও পায়েমিক পুঁজাক্তি সৃষ্টি করতে পারে।

উল্লেখযোগ্য নিদানিক অবস্থা যা থ্রমবোসিসের গঠনে সহায়ক হয়

১। **হৃৎপিণ্ডের অবস্থা**—এ অবস্থাসমূহ হলো বার্ধক্যজনিত হৃৎপিন্ড রোগ। হৃৎপিন্ডের রোগে আক্রান্ত বৃদ্ধের থ্রমবোসিসের শিকার হবার আশংকা থাকে।

পায়ের গোছার মাংসের গভীরে অবস্থিত শিরা সর্বাপেক্ষা অধিক হারে আক্রান্ত হয়।

যে সমস্ত নিয়ামক এ ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে থাকে তারা হলো—

(১) প্রান্তিক রক্ত প্রবাহে নিশ্চলতা,

(২) মাংসপেশী কম ব্যবহার করা,

(৩) বিছানার তোষকের সাথে সংঘর্ষের ফলে শিরার দেওয়ালের আঘাত প্রাপ্তি।

২। **ভেরিকোজ শিরা**—অনিয়মিতভাবে প্রসারিত শিরাতে রক্তবদ্ধতা ও অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। ফলে সেখানে থ্রমবাস গঠনের অনুকূল পরিবেশ দেখা দেয়।

৩। **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিশ্চলতা**—বিছানায় দীর্ঘকাল শায়িত অবস্থায় থাকলে অথবা কোন অঙ্গ প্লাস্টার দ্বারা দীর্ঘদিন নিশ্চল হয়ে থাকলে অথবা পক্ষাঘাতের জন্য অকার্যক্ষম হলে আক্রান্ত পেশীসমূহের রক্তনালীতে থ্রমবোসিস দেখা দিতে পারে। রক্তবদ্ধতা এবং রক্তনালীতে আঘাত এর জন্য দায়ী।

৪। **অস্ত্রোপচারের জটিলতা**—অস্ত্রোপচারের বিশেষ করে পেটে ও পেলভিসে অস্ত্রোপচারের পর শিরাতে থ্রমবোসিস হতে দেখা যায়।

বার্ধক্য, রক্তবদ্ধতা, হৃৎপিন্ডের কার্যশিথিলতা এই অবস্থার সৃষ্টিতে সহায়ক হয়।

৫। **প্রসবের পর**—পেলভিক শিরার উপর চাপ, থ্রমবোফ্লেভাইটিস এবং প্লাজমা উপাদানের পরিবর্তন ইত্যাদি প্রসবের পর থ্রমবাস গঠনে সাহায্য করে।

৬। **দুষ্টগ্রাহীতা**—অনেক ক্ষেত্রে দুষ্টগ্রাহী টিউমারে থ্রমবোসিস গঠিত হতে দেখা যায়। দুষ্টগ্রাহী টিউমার কোষ হতে এক প্রকার বস্তু নিসৃত হয় যার সাথে থ্রমবোপ্লাসটিনের সাদৃশ্য আছে। থ্রমবোসিস গঠনের ব্যাপারে এর ভূমিকা আছে বলে মনে করা হয়।

৭। **এনডোক্রিন**—জন্ম নিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধক বড়ি যার মধ্যে এস্ট্রোজেন বিদ্যমান থাকে, কখন কখনও থ্রমবোসিস সৃষ্টি করে থাকে।

এমবোলিজম

এমবোলিজম বলতে এমন পদ্ধতিকে বোঝায় যা দ্বারা রক্তপ্রবাহের এক স্থান হতে কোন নিরেট পদার্থ অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়ে দানা বাঁধে ও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। স্থানান্তরিত বস্তুকে এমবোলাস বলে। যে সমস্ত দ্রব্য এমবোলাস হিসাবে কাজ করতে সক্ষম তারা হলো ঃ
(১) থ্রমবাস, (২) গ্যাস বা বায়ু, (৩) চর্বি, (৪) এমনিওটিক ফ্লুইড, (৫) টিউমার কোষ, (৬) এথেরোমা, (৭) পরজীবী।

(১) থ্রমবাস

থ্রমবাসই সর্বাপেক্ষা অধিক হারে (শতকরা ৯৫ ভাগ) এমবোলাস হিসাবে কাজ করে থাকে। থ্রমবাস শিরা, ধমনী অথবা হৃৎপিন্ডে গঠিত হয়। এর মধ্যে কাফ (calf) মাংসপেশীর শিরাতে সর্বাধিক হারে দেখা যায়। অন্যান্য যে সমস্ত শিরা আক্রান্ত হয়ে থাকে তারা হলো প্রসটেটিক ভেন, ব্রড লিগামেন্ট, ডিম্বাশয় ও জরায়ুর শিরাসমূহ।

এখানে সৃষ্ট হওয়া থ্রমবাস ফুসফুসে পৌঁছায় ও ফুসফুসের এমবোলিজম সৃষ্টি করে থাকে।

ধমনীতে এমবোলাসের উৎস হল ঃ (১) হৃৎপিন্ড ভালভের উপর যে ভেজেটেটিভ থ্রমবাস সৃষ্টি হয় তা, (২) এয়োর্টার ভেতরের দেওয়ালে সৃষ্টি হওয়া থ্রমবাস এয়োর্টিক এনিউরিজম এ পাওয়া যায়।

এর প্রভাবে মজে যাওয়া ধমনী দ্বারা যে কলারক্ত সরবরাহ পেয়ে থাকে সে অংশে কোষপচিতি ঘটে।

সাধারণতঃ যে অঙ্গসমূহ আক্রান্ত হয়—মস্তিষ্ক, বৃক্ক, নিম্নাঙ্গ(পা)।

(২) বায়ু বা গ্যাস

বায়ু বা গ্যাস প্রচুর পরিমাণে রক্তপ্রবাহে প্রবেশ করলে এমবোলিজম সৃষ্টি হতে পারে।

সূত্রসমূহ—নিম্নলিখিত সূত্র হতে এমবোলিজম সৃষ্টি হতে পারে ঃ-

(ক) কৃত্রিম নিউমোথোরাক্স—যদি বৃহৎ আকারের শিরায় ছিদ্র বা ফুটো হয়,

(খ) সন্তান প্রসবকালে—জরায়ুর মাংসপেশীসংকোচনকালে বৃহৎ আকারের

শিরা সাইনাসে যদি প্রচুর পরিমাণ বাতাস প্রবেশ করে তবে তা এমবোলাসে পরিণত হতে পারে।

অবৈধ গর্ভপাতে এই ধরনের ঘটনা ঘটার বহু রিপোর্ট পাওয়া যায়।

(গ) বক্ষে অথবা গলাতে অস্ত্রোপচারের সময় থোরাসিক শিরাতে আঘাত পাওয়ার ফলে এ ঘটতে পারে।

(ঘ) বক্ষে আঘাত পাওয়া।

(ঙ) সেলাইন ঢোকানোর সময় ভুলক্রমে বেশী বাতাস ঢুকে পড়ে এ ঘটাতে পারে।

(চ) কেসিয়েনএর অসুখ—ডুবুরীরা যখন সমুদ্রের গভীর পানির নিচে নামে তখন প্রচন্ড চাপের সম্মুখীন হয়। হঠাৎ যদি তারা পানির বাইরে বেরিয়ে আসে তবে উচ্চচাপ হঠাৎ কমে যায়। এর ফলে রক্তে মিশে থাকা গ্যাস অদ্রবীভূত হয়। অক্সিজেন পুনরায় দ্রবীভূত হয় কিন্তু নাইট্রোজেন গ্যাস অমিশ্রিত অবস্থায় থাকে যা এমবোলিজম হিসাবে আচরণ করতে পারে।

(ছ) বৃক্কের ব্যর্থতার জন্য—হেমোডায়ালাইসিস দ্বারা চিকিৎসার ক্ষেত্রে এমন ঘটতে পারে।

(৩) চর্বি জাতীয় দ্রব্য

চর্বির গোলক রক্তের মধ্যে যদি ঢোকে তবে তা এমবোলাস হিসাবে আচরণ করতে পারে। এ দুইভাবে সম্ভবপর হয় :-

(ক) চর্বির ডিপোতে বড় বড় রক্তনালী যদি আঘাতের ফলে ফুটো হয়ে যায়।

(খ) হাড় ভেঙ্গে যদি অস্থিমজ্জায় ঢোকে।

(গ) মানসিক অশান্তিতে চর্বি ডিপো হতে প্রচুর পরিমাণে চর্বিমুক্ত হয় যা রক্তে প্রবেশ করে গুচ্ছ বাঁধতে ও এমবোলিজম সৃষ্টি করতে পারে।

এ ক্ষেত্রে রোগের লক্ষণাদি দুভাবে আত্মপ্রকাশ পেতে পারে : ফুসফুস জনিত উপসর্গ এবং মস্তিষ্কজনিত উৎসর্গ।

(৪) এমনিউটিক ফ্লুইড

এমনিউটিক ফ্লুইডজনিত এমবোলিজম প্রসবকালে মৃত্যুর এক প্রধান কারণ। কেরাটিন সম্পন্ন স্কোয়ামস, লিগিউম, চুল এবং ঝিল্লীরস প্রসবকালে বিদীর্ণ হওয়া ভেনিউলে প্রবেশ করে এমবোলিজম সৃষ্টি করতে পারে।

এ ক্ষেত্রে শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রের বিফলতা এবং শকের জন্য রোগীর দ্রুত মৃত্যু ঘটে।

নিদানিক লক্ষণাদি সৃষ্টির কারণসমূহ হলো—পালমোনারী ধমনী অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং রক্তনালীর অভ্যন্তরে রক্তজমাট বাঁধে যার ফলে ফিবরিন অপসারিত হয় ও রক্তপাত ঘটে।

এমনিউটিক ফ্লুইডে থ্রমবোপ্লাসটিন জাতীয় একপ্রকার দ্রব্য বিদ্যমান থাকে যার প্রভাবও এক্ষেত্রে কাজ করে থাকে।

(৫) **এথেরোমা**—আরোর্টা ও অন্যান্য ধমনীতে সৃষ্টি হওয়া এথেরোমা এমবোলাস হিসাবে আচরণ করতে পারে।

(৬) **পরজীবী**—এমিবা, মাইক্রোফাইলেরী ইত্যাদি এমবোলাস হিসাবে আচরণ করতে পারে।

(৭) বিজাতীয় দ্রব্য।

এমবোলাসের প্রভাব

এমবোলাসের প্রভাবে যে অসুবিধার সৃষ্টি হয় তার কারণ হলো রক্তনালী অবরুদ্ধ হওয়া। এর প্রভাবের ধরন নিম্নলিখিত নিয়ামকের উপর নির্ভরশীল—

(১) **কোলেটেরাল রক্তপ্রবাহ**—কোলেটেরাল রক্তপ্রবাহ যদি পর্যাপ্ত হয় তো কিছুই ঘটে না। কারণ এ ক্ষেত্রে কলার প্রয়োজন কোলেটেরাল রক্তপ্রবাহ মেটাতে সক্ষম। পক্ষান্তরে, কোলেটেরাল রক্তপ্রবাহ যদি ক্ষীণ হয় তবে রক্তচাহিদা পূর্ণভাবে মেটে না। এর ফলে কলায় গুরুতর রূপে কোষ-পচিতি দেখা দেয়। একে ইনফারকশন বলে। রোগীর মৃত্যুও ঘটতে পারে।

(২) আক্রান্ত ধমনীর আকার,

(৩) আক্রান্ত অঙ্গ,

(৪) থ্রমবাসের আকার,

(৫) কত দ্রুত এমবোলাস সংস্থাপিত হয়েছে তার উপর।

উপরোক্ত নিয়ামকের উপর নির্ভর করে যা ঘটতে পারে তা হলো :-

ইনফারকশন—যেমন হৃৎপিণ্ডের ইনফারকশন, মস্তিষ্কের ইনফারকশন ইত্যাদি। নিদানিকভাবে নিম্নলিখিত স্থানের এমবোলিজম গুরুত্বপূর্ণ :-
(১) ফুসফুসের ধমনী, (২) মেসেনটেরিক ধমনী, (৩) মস্তিষ্কের ধমনী, (৪) রেটিনাল ধমনী ইত্যাদি।

পালমোনারী এমবোলিজম

ফুসফুসের এমবোলিজম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ অস্ত্রোপচারোত্তর জটিলতার মধ্যে এর এক উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে অস্ত্রোপচারের ফলে মৃত্যুর শতকরা আট ভাগের জন্য এটাই দায়ী।

এমবোলাসের ফলে পালমোনারী ধমনীতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়ায় ফুসফুসে ব্যাপকভাবে ইনফারকনশন বা কলা বিনষ্টি ঘটে। অধিক বয়সে এর প্রাদুর্ভাব বেশী। একথা স্মরণ রাখতে হবে যে পালমোনারী ধমনী অথবা এর বড় কোন শাখা পুরাপুরি অবরুদ্ধ হওয়ায় কোষ-পচিতির কোন লক্ষণ দেখা না দেওয়ার পূর্বেই মৃত্যু ঘটতে পারে। পক্ষান্তরে পালমোনারী ধমনীতেই প্রথমে থ্রমবাস সংঘটিত হয় ও কোষ-পচিতি সৃষ্টি করে। এমবোলাসের প্রয়োজন ঘটে না। প্যাসিভ কনজেশন এবং পানিবদ্ধতা যা ইতিমধ্যেই ফুসফুসের রক্ত প্রবাহে বিঘ্নতা সৃষ্টি করে, কলাবিনষ্টি বা ইনফারকনশন সৃষ্টিতে সহায়ক হয়ে থাকে।

এমবোলাস তিন প্রকারের :

(ক) বৃহৎ—এই শ্রেণীর এমবোলাস বৃহৎ আকারের ধমনীকে অবরোধ করে ও সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটায়।

(খ) মধ্যম—এই শ্রেণীর এমবোলাস কলার বিনষ্টি বা ইনফারকশন সৃষ্টি করে ও তার লক্ষণাদি উৎপন্ন করে।

(গ) ক্ষুদ্র—এরা উপসর্গ সৃষ্টি করে কিন্তু পরীক্ষা করলে কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

পালমোনারী এমবোলিজমের উৎস অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিরাসমূহ যে সমস্ত শিরা এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তা হলো পায়ের গোছার গভীরস্থ শিরা, প্রসটেট গ্রন্থির শিরা, ভেনাক্যাভা, দক্ষিণ দিককার অলিন্দ, ইলিয়াম ও পেলভিক শিরা।

প্যারাডক্সিকাল এমবোলিজম

এ এমন এক শ্রেণীর এমবোলিজম যা শিরা হতে উৎপন্ন হয় কিন্তু পালমোনারী ধমনীতে না আটকে সিসটেমিক রক্তপ্রবাহে পৌছায় ও স্থান গ্রহণ করে। ফেমোরাল এবং পেলভিক শিরায় সংঘটিত থ্রমবাস দ্বারা মস্তিষ্কের ধমনীতে এমবোলিজম সৃষ্টি করে, যার ফলে অর্ধপক্ষাঘাত দেখা দেওয়া এর এক উদাহরণ। এর সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হলো যে হৃৎপিণ্ডের উর্ধ্বমুক্ত ফোরামে ওভেলের মধ্য দিয়ে থ্রমবাস সিসটেমিক রক্তপ্রবাহে স্থানান্তরিত হয়।

পশ্চাৎমুখী এমবোলিজম

এমবোলাস যখন রক্তপ্রবাহের বিপরীত দিকে অগ্রসর হয় তখন তাকে পশ্চাৎমুখী বা রেট্রোগ্রেড এমবোলাস বলে। সামনের রক্তনালীতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে এ ঘটে থাকে। যেমন দুষ্টগ্রাহী টিউমারের ক্ষেত্রে।

ইনফারকশন
(কলা বিনষ্টি)

যখন প্রধান কোন ধমনী হঠাৎ অবরুদ্ধ হয় এবং কোলেটেরাল ধমনী-সমূহ পর্যাপ্ত থাকে না তখন উক্ত স্থানের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কোয়াগুলেটিভ জাতীয় কোষপচিতি সৃষ্টি হয়। একে ইনফারকশন বা কলাবিনষ্টি বলে।

অবরুদ্ধতা শিরা অথবা ধমনীতে দেখা দিতে পারে। প্রথমে আক্রান্ত স্থানে রক্তাধিক্যতা দেখা দেয়। কিন্তু তা সাময়িক এবং ক্ষণস্থায়ী। শীঘ্রই কলা রক্তশূন্য ও ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে। উক্ত স্থানে কোয়াগুলেটিভ জাতীয় কোষপচিতি শুরু হয়। অঙ্গের কাঠামোর দেহরেখা অস্পষ্ট হলেও দৃশ্যমান থাকে।

শ্রেণী

(১) কোলেটেরাল রক্তপ্রবাহের কার্যকারিতার ভিত্তিতে কলা বিনষ্টি নিম্ন প্রকারের হয় :

(ক) রেড ইনফারকশন বা রক্তাভ কলাবিনষ্টি

(খ) পেল ইনফারকশন বা ফ্যাকাশে।

(২) বীজাণুর উপস্থিতির ভিত্তিতে :

(ক) সেপটিক,

(খ) জীবাণুমুক্ত।

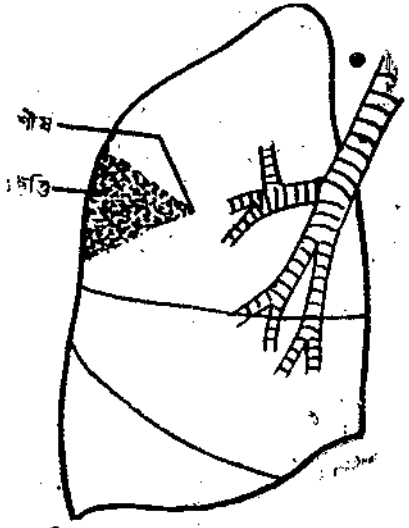

চিত্র ৪৬ : ফুসফুসে ইনফারকশন

(ক) রক্তাভ কলাপচিতি—যখন রক্তনালী অবরুদ্ধ হয় তখন কোলেটেরাল

রক্তপ্রবাহ বা সহপার্শ্বিক রক্তনালী আরো সক্রিয় হয় ও অধিক পরিমাণে রক্ত সরবরাহ করে। যার ফলে এরা স্ফীত হয় এবং আক্রান্ত কলাকে ঘিরে চওড়া রক্তপাতময় প্রান্তরেখা দেখা দেয়। এই রেখা আক্রান্ত এলাকা ও স্বাভাবিক কলাকে বিভক্ত রাখে। অবরুদ্ধ রক্তনালী হতে প্রচুর পরিমাণ রক্ত বের হয়ে পড়ে। প্রান্তরেখা যদি খুব চওড়া হয় তবে আক্রান্ত স্থানকে রক্তাভ দেখায় ও সে ক্ষেত্রে একে রেড ইনফারক্ট্ বা রক্তাভ পচাকলা বলে।

স্পঞ্জের ন্যায় অঙ্গ যেমন ফুসফুস, এবং শিরাজনিত কলাপচিতি সর্বদাই রক্তাভ শ্রেণীর কলাপচিতি হয়ে থাকে।

(খ) ফ্যাকাশে কলাপচিতি—যখন সহপার্শ্বিক রক্তপ্রবাহ ক্ষীণ হয়ে থাকে তখন কলাপচিতি ও স্বাভাবিক কলাকে পৃথককারী প্রান্তরেখা সরু হয় এবং আক্রান্ত এলাকা ফ্যাকাশে দেখায়। একে ফ্যাকাশে কলাপচিতি বলে।

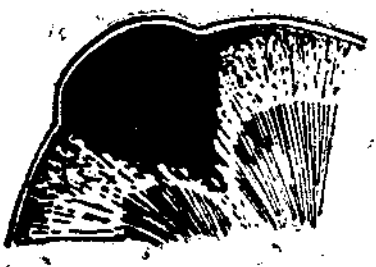

চিত্র ৪৭ঃ বৃক্কের ইনফারকশন

ধমনীজাত কলাপচিতি প্রাথমিক অবস্থায় রক্তাভ হয়ে থাকে। কিন্তু পরে তা ফ্যাকাশে কলাপচিতিতে রূপান্তরিত হয়।

খালি চোখে দৃশ্যমান অবয়ব

বিনষ্ট কলা কীলক আকার (wedge-shaped) হয় যার চওড়া পাশ বাহিরের দিকে ও শীর্ষভাগ আক্রান্ত রক্তনালীতে অবস্থিত থাকে। বহিসীমা প্রথমে অনির্দিষ্ট থাকে পরে নির্দিষ্টভাবে রেখায়িত হয়। কখন কখন এবড়ো থেবড়ো হওয়ায় মানচিত্রের রূপ ধারণ করে।

নিরেট কলার ক্ষেত্রে আক্রান্ত অঙ্গ ফ্যাকাশে রং ধারণ করে। কারণ রক্তপাতের পরিমাণ এখানে অল্প। পক্ষান্তরে স্পঞ্জসুলভ অঙ্গে প্রচুর রক্তপাত ঘটায় তা রক্তাভ রং ধারণ করে।

রক্ত ও প্রদাহজনিত ক্ষরণ চুয়ে পড়ে জমা হওয়ার ফলে আক্রান্ত

স্থানটির ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। স্থানটি রক্তাধিক্যময় রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। রক্তাভ কলাপচিতির ক্ষেত্রে এর বেড চওড়া এবং ফ্যাকাশে কলাপচিতির ক্ষেত্রে সরু হয়। উপরতল কিছুটা দাবানো ও ক্ষরণ দ্বারা আবৃত থাকে।

আণুবীক্ষণিক চিত্র—ইনফারকশনে কোষের যে পরিবর্তন ঘটে তা মূলতঃ কোয়াগুলেশন সুলভ কোষ-পচিতি। এ ক্ষেত্রে কোষের কিনারা অস্পষ্ট হলেও বিদ্যমান থাকে। কিন্তু যতদিন যেতে থাকে রক্তপাত ও প্রদাহ দেখা দেয় ও চিত্রের পরিবর্তন ঘটে। চব্বিশ ঘন্টা পরে লোহিত কণিকার বিনষ্ট হয় এবং অবশেষে ম্যাকরোফেজের মধ্যে ধূসর সোনালী রংয়ের হেমোসিডেরিন রঞ্জনদানা দেখা দেয়। সাথে ফাইব্রোব্লাসটের সংখ্যাপ্রাচুর্য ঘটে। কোষের সাইটোপ্লাজম ভঙ্গুর হয়ে পড়ে এর কেন্দ্রকাসমূহে যথাক্রমে পিকনোসিস, ক্যারিওহেক্সিস ও কেরিওলাইসিস দেখা দেয়। প্রদাহজনিত পরিবর্তন প্রশমিত হলে তন্তু-প্রাচুর্য দেখা দেয়। যার ফলে উক্ত স্থান স্কারে পরিণত হয়। মধ্যস্থানে অবস্থিত কোষ-পচিতিযুক্ত স্থানের ক্ষত পূরণে বিলম্ব ঘটে। এর কারণ, চতুষ্পার্শ্বের তন্তু-কলায় রক্তাল্পতার জন্য এখানে যথেষ্ট পুষ্টি পৌঁছায় না।

আক্রান্ত অঙ্গসমূহ—নিম্নলিখিত অঙ্গসমূহ সাধারণতঃ কলাপচিতির শিকার হয়ঃ ফুসফুস, বৃক্ক, প্লীহা, হৃৎপিন্ড, অন্ত্র, সেরেব্রাম, রেটিনা।

ফুসফুস—এ ক্ষেত্রে কলা-পচিতি সর্বদা রক্তাভ। আক্রান্ত স্থান শক্ত, টকটকে লাল, ত্রিকোণ বিশিষ্ট হয়, যার ভিত্তি বাহিরের তলের দিকে ও শীর্ষ ভেতরের দিকে অবস্থিত। স্থানটি সামান্য নিচু এবং চতুর্দিকে রক্তাধিক্যময় কলা দ্বারা পরিবেষ্টিত।

বৃক্ক—এ অনিয়মিতভাবে অবস্থিত অথবা ত্রিকোণ বিশিষ্ট স্থান; এর ভিত্তি বাইরের তলে অবস্থিত। এ সামান্য নিচু এবং চতুর্দিকে রক্তাধিক্যময় স্থান দ্বারা পরিবেষ্টিত।

প্লীহা—এ ক্ষেত্রে কলা-পচিতি রক্তাভ অথবা ফ্যাকাশে দু'প্রকারের হতে পারে। অন্যান্য বৈশিষ্ট্য প্লীহার কলা-পচিতির মত।

সেরেব্রাম—এ ক্ষেত্রে কলা-পচিতি হওয়ার ফলে জলকোষএর সৃষ্টি হয়।

হৃৎপিণ্ড—এখানে কলা-পচিতি খুব সাধারণ। এ এক মারাত্মক অবস্থা। হৃৎপিন্ডের অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

কারণসমূহঃ যে সমস্ত কারণে রক্তনালীতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় এবং সে সমস্ত কারণে কলা-পচিতি সৃষ্টি হয় তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হোল— (১) থ্রমবাস, (২) এমবোলাস, (৩) বাইরের চাপ ইত্যাদি।

নিদানিক অবস্থা ঃ কয়েকটি নিদানিক অবস্থা যেখানে কলা-পচিতি মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে তা নিচে উল্লেখ করা হলো ঃ

(১) হৃদপিন্ডের কলা-পচিতি
(২) মস্তিষ্কের ,,
(৩) রেটিনার ,,
(৪) মেসেন্টিরুক ধমনী ,,

পরিণতি—কলা-পচিতির পরিণতি নিম্নে উল্লেখিত যে-কোনটি হতে পারে ঃ (১) তন্তুপ্রাচুর্য দ্বারা ক্ষত পূরণ বা স্কার গঠন, (২) হায়েলিনাইজেশন, (৩) কালসিফিকেশন, (৪) প্রদাহ ইত্যাদি।

ইসকেমিয়া বা রক্তস্বল্পতা

কোন কলার রক্ত সরবরাহকারী রক্তনালী অবরুদ্ধ হলে উক্ত কলায় রক্তের অল্পতা দেখা দেয়। এই অবস্থাকে রক্ত স্বল্পতা বলে।

প্রভাব ঃ রক্তস্বল্পতার ফলে নিম্নলিখিত অসুবিধার সৃষ্টি হয় ঃ

(১) হাইপোকসিয়া বা অক্সিজেন-স্বল্পতা,
(২) বর্জ্য পদার্থ নিষ্ক্রমণ পুরাপুরিভাবে হতে পারে না,
(৩) কলা পর্যাপ্ত পুষ্টি পেতে পারে না।

কারণসমূহ ঃ রক্তস্বল্পতার কারণসমূহকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে ঃ

ধমনী (ক) তাৎক্ষণিক—এর কারণ নিম্নরূপ ঃ বন্ধন, পাক খাওয়া, এমবোলাস জমাট রক্ত দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়া, এথেরোমা ইত্যাদি।

(খ) দীর্ঘস্থায়ী—প্রধান কারণসমূহ হোল ঃ ধমনী-কাঠিন্য, বহির্চাপ, ওষুধ অথবা রোগপ্রসূত সংকোচন যেমন রেনডএর অসুখ, থ্রমবো এনজাইটিস অবলিটেরান্স ইত্যাদি।

শিরা ঃ শিরার রক্তপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হলে শিরার অভ্যন্তরে রক্তবদ্ধতা সৃষ্টি হয় ও কলার রক্তপ্রবাহ দারুণভাবে ব্যাহত হয়। ফলে কলা পচিতি ঘটে।

উদাহরণ—(ক) মেসেনটেরিক ভেন থ্রমবোসিস, (খ) অবরুদ্ধ হারনিয়া, (গ) ক্যাভারনাস সাইনাস থ্রমবোসিস, (ঘ) ভেরিকোস ভেন ইত্যাদি।

ফলাফল ঃ- রক্ত স্বল্পতার ফলাফল নিম্নরূপ ঃ

১) **তন্তু প্রাচুর্যতা**—প্যারেনকাইমার ডিজেনারেশন হয় ওপরে মৃত্যু ঘটে। চাপজনিত কারণে শীর্ণতার ফলে উদ্ভূত তন্তুপ্রাচুর্য এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বৃক্কে, যকৃতে, মস্তিষ্কে তন্তুপ্রাচুর্য এর উদাহরণ।

২) **কলা-পচিতি** ঃ রক্তস্বল্পতা যদি হঠাৎ সংঘটিত হয় তবে কলা-পচিতি দেখা দেয়।

৩) কর্ম ব্যাঘাতজনিত গন্ডগোল—উদাহরণ, এনজাইনা পেকটোরিস, রক্তনালীর মৃদু সংকোচনে কলায় উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন ঘটে না।

রক্তবদ্ধতা (congestion)

দেহের কোন অংশের রক্তনালীর ভেতর অতিমাত্রায় রক্ত জমা হওয়াকে রক্তবদ্ধতা বলে।

শ্রেণীবিভাগ

রক্তবদ্ধতাকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে—

(ক) ধমনীজাত—হাইপারমিয়া,

(খ) শিরাজাত—

১। তাৎক্ষণিক অথবা দীর্ঘস্থায়ী

২। সিসটেমিক বা পোর্টাল ও পালমোনারী।

(গ) ঝিল্লী-শিরাজনিত।

প্রধান প্রধান শ্রেণীসমূহ নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

হাইপারমিয়া বা রক্তাধিক্যতা—এ ক্ষেত্রে রক্ত ক্যাপিলারী ও আরটেরিওলে মাত্রাধিক্যভাবে জমা হয়। এরিথিমা, মুখচোখ লাল হওয়া ইত্যাদি এর লক্ষণসমূহ।

তাপ প্রয়োগ ও প্রদাহে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। প্রদাহের ক্ষেত্রে বীজাণুর দ্বারা সৃষ্ট অভিবিষের প্রভাবই এর কারণ।

শিরাজনিত রক্তবদ্ধতা—যখন শিরাসমূহে রক্ত জমা হওয়ার ফলে রক্তাধিক্যতার সৃষ্টি হয় তখন তাকে পরোক্ষ বা প্যাসিভ রক্তবদ্ধতা বলে। এই অবস্থা নিম্ন প্রকারের হতে পারে ঃ

ক) স্থানীয় অথবা সামগ্রিক,

খ) তাৎক্ষণিক অথবা দীর্ঘস্থায়ী।

স্থানীয় কোন শিরার কারণে রক্তবদ্ধতা দেখা দিতে পারে তখন তাকে

স্থানীয় রক্তবদ্ধতা বলে। পক্ষান্তরে ব্যাপক রক্তবদ্ধতার ক্ষেত্রে ফুসফুস অথবা হৃৎপিন্ডের প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান থাকে। কারণ এ দুই অঙ্গের মধ্য দিয়ে দেহের সমগ্র রক্ত প্রবাহিত হয়ে থাকে।

সামগ্রিক শিরাজনিত রক্তবদ্ধতাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

সামগ্রিক শিরাজনিত রক্তবদ্ধতা

যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে সামগ্রিক শিরাজনিত রক্তবদ্ধতা সৃষ্টি হয় তখনই যখন প্রতিবন্ধকতা রক্তপ্রবাহের মধ্যস্থলে বিদ্যমান থাকে এবং যার প্রভাব দেহের সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। ফুসফুস ও হৃৎপিন্ড এমন দু'অঙ্গ যার মধ্যদিয়ে দেহের সমস্ত রক্তকে চলাচল করতে হয়। সে কারণে এই দুই অঙ্গের রক্তপ্রবাহে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে সামগ্রিক শিরাজনিত রক্তবদ্ধতা দেখা দেয়। ফুসফুসে হৃৎপিন্ডের ডান দিকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে সিসটেমিক রক্তবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে হৃৎপিন্ডের বাম দিকের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে পালমোনারী রক্তাধিক্যতা সৃষ্টি হয়।

দীর্ঘস্থায়ী রোগে উভয় অবস্থাই একে অপরের সাথে মিশে যায়।

কারণসমূহ ঃ সামগ্রিক শিরাজনিত রক্তবদ্ধতার কারণসমূহ হলো ঃ

(১) হৃৎপিন্ডে প্রতিবন্ধকতা—এর কারণ (ক) মাইট্রাল স্টেনোসিস, (খ) মাইট্রাল ইনকমপেটিনেনস, (গ) এয়োর্টিক স্টেনোসিস, (ঘ) এয়োর্টিক ইনকমপেটিনেনস, (ঙ) হৃৎপিন্ডের বিফলতা।

(২) ফুসফুসের প্রতিবন্ধকতা—যে সমস্ত কারণে ফুসফুসে প্রচুর পরিমাণে তন্তু-প্রাচুর্য সৃষ্টি হয় যেমন যক্ষা, এমপায়েমা, হাঁপানি, নিউমোকোনিওসিস ইত্যাদি।

এর ফলে এলভিওলাসে চাপ সৃষ্টি হয় যার ফলে এলভিওলাসের দেওয়ালের ক্ষতি হয়। এ ছাড়া ক্যাপিলারী নালী সংকুচিত হয় এবং রক্তপ্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

রক্ত বদ্ধতার ফলাফল ঃ রক্তবদ্ধতার ফলাফল নিম্নরূপ ঃ

(১) অপর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহ—ফুসফুসে পানিবদ্ধতার ফলে ও স্বল্প রক্ত চলাচলের ফলে অক্সিজেন সরবরাহ ব্যাহত হয়।

(২) দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস—কলায় অক্সিজেন কম সরবরাহ হওয়ার ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত গতিতে চলে।

(৩) নীলায়ন বা সাইনোসিস—শিরাতে রক্ত দীর্ঘকাল অবস্থান করার ফলে হেমোগ্লোবিনে অক্সিজেনের স্বল্পতা ঘটে ফলে চামড়ার রং বেগুনী হয়। যে অবস্থাকে নীলায়ন বলে।

(৪) পানিবদ্ধতা—রক্তপ্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ফলে শিরাতে রক্তবদ্ধতা

ঘটে। এর ফলে শিরার দেওয়ালে টান পড়ে ও আঘাতপ্রাপ্ত হয়। এছাড়া এর উপর চাপও পড়ে। এর প্রভাবে শিরা হতে কলাতে পানি স্থানান্তরিত হয়। ফলে কলাতে পানি জমে।

অঙ্গের পরিবর্তনসমূহ

সাধারণতঃ আক্রান্ত অঙ্গসমূহ আকারে বড় হয়। এবং গাঢ় বাদামী বং ধারণ করে। ও সেখানে পানি জমে থাকে।

যকৃত ও ফুসফুসে এই পরিবর্তনসমূহ আরও প্রকট হয়ে উঠে।

ফুসফুসের রক্তবদ্ধতার কারণসমূহ : ফুসফুসের রক্তবদ্ধতার প্রধান কারণ সমূহ হলো—এমফাইসিমা, যক্ষ্মাজনিত তন্তু-প্রাচুর্যতা, ফুসফুসের পুঁজাক্তি, ব্রনকাস প্রদাহ, মাইট্রাল স্টেনোসিস, জন্মগত হৃৎপিন্ডের অসুখ ইত্যাদি।

খালি চোখে দৃশ্যমান অবয়ব : ফুসফুস আকারে বড়, রংয়ে গাঢ় বাদামী ও দৃঢ়ত্বে কঠিন হয়। এই অবস্থাকে ব্রাউন ইনডিউরেশন বলে। তন্তু-প্রাচুর্যতা ও বাদামী রং ধারণের ফলে এর সৃষ্টি। কর্তিত তলে এলভোলাস্থ রক্তনালীসমূহ স্ফীত হয় ও রক্ত দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। এর ফলে এদের দানার মত দেখায় ও সহজেই এখানে রক্তপাত ঘটে।

আণুবীক্ষণিক চিত্র : কৈশিকনালী বা ক্যাপিলারীসমূহ সরীসৃপের মত আঁকাবাঁকা ও স্ফীত হয়। এলভেলওলাসের মধ্যে লোহিত কণিকা ও ম্যাক-রোফেজ উপস্থিত হয়। এই সমস্ত ম্যাকরোফেজের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ আয়রন বিদ্যমান থাকে যার উৎস রক্তপাতের ফলে জমা হওয়া রক্ত। এদের হাঁট ফেলিয়ার কোষ বলা হয়। এলভেলওলাসের দেওয়াল প্রথমে জলজ ও পরে তন্তুসম্পন্ন হয়ে থাকে।

যকৃতের পরিবর্তন—আক্রান্ত যকৃত বড় হয়; টিপলে ব্যথা দেয় ও এর ক্যাপসুল বা আবরণী টান টান থাকে। কর্তিত তল দানাদার আকার ধারণ করে। রক্তবদ্ধতার ফলে সৃষ্ট লালচে এলাকা ও 'ফ্যাটিচেঞ্জ' এর ফলে সৃষ্ট ফ্যাকাশে এলাকা পাশাপাশি অবস্থান করার ফলে এরূপ ঘটে থাকে। এ দেখতে নাটমাগ দানার উপর তলের মত। এরূপ অবস্থার যকৃতকে নাটমাগ যকৃত বলে। পরে তন্তুপ্রাচুর্যতার ফলে যকৃত কঠিন রূপ ধারণ করে যাকে কার্ডিয়াক সিরোসিস বলে।

আণুবীক্ষণিক চিত্র—সেন্ট্রাল ভেন বা কেন্দ্রিয়শিরা ও সিনুসয়েডসমূহ স্ফীত হয় ও তাতে রক্তবদ্ধতা দেখা দেয়। সেন্ট্রাল ভেনের দেওয়াল শক্ত হয়। চতুষ্পার্শ্বের এলাকাসমূহে তন্তুপ্রাচুর্যতা ঘটে। লোবের মধ্যবর্তী স্থলের কোষসমূহে শীর্ণতা, ফ্যাটি চেঞ্জ এবং কলাপচিতি ঘটে। অক্সিজেন

স্বল্পতা হলো এর কারণ। এমনকি লোবসমূহ বন্ধও হতে পারে।

স্থানীয় ভেনাস বা শিরা রক্তবদ্ধতা

স্থানীয়ভাবে কোন শিরা অবরুদ্ধ হলে স্থানীয় ভেনাস কনজেশন সৃষ্টি হয়। এর মূল কারণসমূহ হলো থ্রমবাস, এমবোলাস, বাইরের চাপ, বন্ধনী ইত্যাদি। এর প্রভাবে স্থানীয়ভাবে আক্রান্ত কলাতে নীলায়ন ও জলবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

পোর্টাল রক্তবদ্ধতা

এ ক্ষেত্রে পোর্টাল রক্তপ্রবাহে রক্তবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে এদের পাওয়া যায় ঃ

(১) পোর্টাল সিরোসিস,

(২) পোর্টাল শিরায় থ্রমবাস সংগঠন।

এর লক্ষণসমূহ হলো ঃ

উদর শোথ বা এসাইটিস, এসোফেগাসের ভেরিকোসিস, প্লীহার আকার বৃদ্ধি, অর্শ রোগ ইত্যাদি।

ক্যাপিলো ভেনাস হাইপারমিয়া

এ এক ধরনের বিশেষ রক্তবদ্ধতা। ঝিল্লীসমূহের দেওয়াল শিথিল হয়ে যাওয়ার ফলেই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। এর প্রধান কারণসমূহ হলো অক্সিজেন স্বল্পতা, অগ্নিদগ্ধতা এবং শ্বাস রুদ্ধতা।

ডিহাইড্রেশন

ডিহাইড্রেশন এমন এক অবস্থা যেখানে কলাস্থ পানির মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কমে যায়। ডিহাইড্রেশন শুধুমাত্র পানির স্বল্পতায় সীমাবদ্ধ থাকতে পারে অথবা এর সাথে সোডিয়ামের স্বল্পতাও যুক্ত থাকতে পারে।

কারণসমূহ—ডিহাইড্রেশনের কারণসমূহ হলো ঃ

১। পানি গ্রহণের মাত্রা কমে যাওয়া বা কম হওয়া—যে সমস্ত কারণে রোগী পানি কম পান করে তারা হলো, অজ্ঞান অবস্থা, ঢোক গিলার অসুবিধা ইত্যাদি।

২। প্রস্রাবের সাথে অধিক মাত্রায় দেহ হতে পানি বেরিয়ে যাওয়া। এটা ঘটার কারণ হলো—(ক) প্রস্রাব বৃদ্ধির জন্য ওষুধ খাওয়া,

(খ) বহুমূত্র রোগ, (গ) এডিশনের অসুখ, (ঘ) বেশী লবণ নিষ্ক্রমণ করে অন্ত্রের এমন সমস্ত অসুখ ইত্যাদি।

৩। বেশী ঘাম হওয়া—এ ঘটে শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি, হিট স্ট্রোক ইত্যাদিতে। এতে দেহ হতে পানি এবং লবণ দুয়েরই পরিমাণ কমে যায়।

৪। অন্ত্রের মাধ্যমে দেহ হতে পানি বেরিয়ে যাওয়া—যে সমস্ত কারণে মলের সাথে পানি বেশী পরিমাণে বেরিয়ে যায় তারা হলো—

বমি	কলেরা
ডায়েরিয়া	আমাশয়
পাইলোরিক স্টেনসিস	কোলাইটিস
ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রতিবন্ধকতা	

এসব ক্ষেত্রে পানি ও লবণ দুয়ের পরিমাণ কমে যায়।

৫। রক্ত ও প্লাজমা ক্ষরণ—রক্তপাত, অগ্নিদগ্ধতা, শক ইত্যাদিতে রক্ত ও প্লাজমা দেহ হতে বাইরে বেরিয়ে পড়ে।
এ সমস্ত ক্ষেত্রেও পানি ও লবণের কমতি পড়ে।

অমিশ্র পানি স্বল্পতায় রক্তের পরিমাণ হ্রাস পায়। এর ফলে আন্তকোষীয় কলা হতে পানি রক্তে ঢোকে। যার ফলে কোষের অভ্যন্তরস্থ পানি ও তার সাথে পটাশিয়াম লবণ বেরিয়ে আসে ও অন্তর্বর্তী কলায় পৌঁছায়। ফলে কোষ-সমূহের অভ্যন্তরস্থ বিজারকসমূহের কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

কোষবহির্ভূত পানির পরিমাণ কমে গেলে এলডোসটেরোন বেশী মাত্রায় নিঃসৃত হয় যার প্রভাবে রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা কমে যায়। এক কথায় বলা যায়, অমিশ্র পানি স্বল্পতায়, পানি ও পটাশিয়াম কমে যায়; সোডিয়াম কমে না।

মিশ্র পানি স্বল্পতায়, পানি ও সোডিয়াম উভয়ের পরিমাণ কমে যায়। সোডিয়াম কমে যাওয়ার ফলে কোষবহির্ভূত পানির অসমোটিক চাপে বিঘ্নতা সৃষ্টি হয়। একে সংশোধন করার জন্য পানি কোষের মধ্যে প্রবেশ করে যার ফলে কোষবহির্ভূত পানির পরিমাণ দারুণভাবে কমে যায় ও শক সৃষ্টি হয়।

রক্তপাত (Haemorrhage)

রক্তনালী হতে রক্তের বাইরে বের হওয়াকে রক্তপাত বলে। এই পতিত রক্ত দেহের বাইরে বের হতে পারে আবার দেহের মধ্যে কলায় জমা হতে পারে। সাধারণতঃ রক্তনালীর দেওয়াল বিচ্ছিন্ন হয়ে তা ঘটে থাকে।

কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে রক্তনালীর প্রাচীরে কোন ফাটল পরিলক্ষিত হয় না। রক্ত যখন কলায় পঞ্জীভূত হয় ও যায় ফলে কলা ফুলে উঠে তখন তাকে হেমাটোমা বলে।

যখন রক্ত কোন দেহথলিতে জমে তখন তার নামকরণ কোন্ দেহথলি আক্রান্ত তার উপর নির্ভর করে। যেমন পেরিকারডিয়ামের ক্ষেত্রে তার নাম হয় হেমোপেরিকারডিয়াম। প্লুরা ও অণ্ডকোষ থলির ক্ষেত্রে এর নাম যথাক্রমে হেমোথোরাক্স ও হেমাটোসিল। এপোপ্লেক্সি বলতে যে-কোন অঙ্গে প্রচুর পরিমাণে রক্ত জমাকে বোঝায় যদিও সাধারণভাবে মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে এ শব্দ ব্যবহৃত হয়। চামড়ার নীচে পিনের মাথার মত ছোট রক্তপাতকে (২ মিলি ব্যাসার্ধ) পেটেচি বলে। এর চেয়ে বড় ও বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চামড়া বা বিল্লীর নীচে রক্তপাতকে একিমোসিস বলে। পারপিউরা বলতে চামড়ার নীচে যেকোন রক্তপাতকে বোঝায়।

কারণসমূহ ঃ রক্তনালী বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে রক্তপাত ঘটার কারণ ঃ

১। আঘাত—যার ফলে রক্তনালীর দেওয়াল ছিন্ন হয়।
২। এনিউরিজম-জনিত স্ফীতি,
৩। ব্যাকটেরিয়াজাত অভিবিষের প্রভাবে—
   (ক) সেপ্টিসিমিয়া,
   (খ) মেনিনগোকক্কাস দ্বারা সংঘটিত প্রদাহ,
   (গ) টাইফয়েড।
৪। উচ্চ রক্তচাপ,
৫। রক্তনালীর ডিজেনারেশন এবং কোষ-পচিতি ঃ যেমন—পেরিআরটেরাইটিস নডোসা, এস-এল-ই, মেডিয়াল নেকরোসিস, স্কার্ভি,
৬। পরজীবী দ্বারা সৃষ্ট প্রদাহ,
৭। হেমসট্যাটিক প্রক্রিয়ার হেরফের যেমন—হেমোফাইলিক, থ্রমবোসাইটোপেনিয়া, ভিটামিন-কে-র স্বল্পতা।

শ্রেণীবিভাগ ঃ রক্তপাতকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ

(১) তাৎক্ষণিক অথবা দীর্ঘস্থায়ী,
(২) গোচর অথবা অগোচর,
(৩) পেটেচিয়াল (ক্ষুদ্র পিনের মাথার মত), অথবা একিমোসাল (বড় ও বিস্তীর্ণ)।

পরিবর্তন ঃ রক্তপাতের পরিমাণ অল্পস্বল্প হলে লোহিত কণিকাসমূহ ম্যাকরোফেজ কর্তৃক ভক্ষিত হয়ে অপসারিত হয়। যদি রক্তপাতের মাত্রা বেশী হয় তবে উক্ত স্থানে লোহিত কণিকা জমা হয় পরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার ফলে হিমোগ্লোবিন মুক্ত হয় ও বাহিরে বের হয়ে পড়ে। এ থেকে

দৃঢ় পদার্থে পরিণত হয়ঃ

(ক) হেমোসাইডেরিন—এর মধ্যে আয়রন বিদ্যমান থাকে; প্রুসিয়ান ব্লু প্রতিক্রিয়া দেয় ও এরা কোষ ভক্ষণের শিকার হয়।

(খ) হেমোটয়ডিন—এরা আয়রন বিবর্জিত; দীর্ঘস্থায়ী রক্তপাতের এলাকার চারপাশে স্ফটিক বা দানার আকারে বিরাজ করে। এবং কিছু অংশ বিলিরুবিনে পরিণত হয়।

এই কারণে প্রচুর রক্তপাতের পর রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা বেড়ে যায়।

নিদানিক গুরুত্বঃ রক্তপাতের প্রভাব এবং তার নিদানিক গুরুত্ব নিম্নলিখিত নিয়ামকের উপর নির্ভরশীলঃ

(১) রক্তপাতের মাত্রা, (২) রক্তপাতের হার, (৩) আক্রান্ত অঙ্গ।

মস্তিষ্কে অথবা পেরিকারডিয়ামে সামান্য রক্তপাতও সাংঘাতিক হতে পারে। পক্ষান্তরে তাৎক্ষণিকভাবে দেহের রক্তের শতকরা বিশ ভাগ দেহ হতে বার হলে তেমন কোন যায়-আসে না যদি সাথে সাথে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়।

অন্ত্রের ও চামড়ার মধ্য দিয়ে দীর্ঘস্থায়ী রক্তপাত আয়রন শূন্যতার এক বিশেষ কারণ।

পক্ষান্তরে কলার অভ্যন্তরে রক্তপাত ঘটলে, ধ্বংসপ্রাপ্ত লোহিত কণা হতে নির্গত আয়রন হেমোগ্লোবিন সংশ্লেষণে ব্যবহৃত হতে পারে। তাই এ কম ক্ষতিকর।

পানিবদ্ধতা বা এডেমা

আধুনিককালে মনে করা হয় যে, দেহস্থ সমগ্র পানির বিন্যাস নিম্নরূপঃ

১। **কোষ-বহির্ভূত পানি**—শতকরা ২০ ভাগ (২০%), এরা নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্তঃ-

ক) প্লাজমা— ৫%

খ) কোষ-অন্তর্বর্তী—১৫% পানি।

কোষ-বহির্ভূত পানি সোডিয়াম সমৃদ্ধ কিন্তু এতে পটাশিয়ামের মাত্রা অল্প। এর পরিমাণ বৃক্ক, ফুসফুস ও এনড্রোক্রিনের প্রভাবের উপর নির্ভরশীল।

২। **কোষ-অন্তর্ভূত পানি**—এর পরিমাণ দেহের ওজনের ৪০% ভাগ এবং এ পটাশিয়াম সমৃদ্ধ। কলার বিভিন্ন প্রকোষ্ঠের (Intra and extra cellulus

পানি সর্বদাই পরস্পরের মধ্যে চলাচল করে ও নিজেদের মধ্যে সমতা রক্ষা করে যা স্বাস্থ্যের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

যে প্রক্রিয়াতে পানির মেটাবলিজম নিয়ন্ত্রিত হয় তা ফিজিওলজির পাঠ্য পুস্তকে পূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে এর বিশেষ দিকগুলো দেওয়া গেল ঃ

যে সমস্ত নিয়ামকসমূহ পানির মেটাবলিজমের উপর প্রভাব বিস্তার করে তারা হলো ঃ

(১) 'থার্স্ট মেকানিজম' দ্বারা সৃষ্ট তৃষ্ণার জন্য পানি পান করা।

(২) পানি ক্ষরণ—প্রস্রাব ও ঘামের মারফত পানি দেহ হতে বের হয়ে থাকে। চামড়া, ফুসফুস, অন্ত্র, বৃক্ক ইত্যাদি দ্বারা দেহ হতে কঠিন পদার্থ বের করতে হলে কমপক্ষে ৫০০ মিলি প্রস্র হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

(৩) পসটেরিয়র পিটিউটারি গ্রন্থি হতে নিঃসৃত প্রস্রাব-কমানো হরমোন।

সংজ্ঞা ঃ সেরাস ক্যাভিটি বা ঝিল্লী দ্বারা আচ্ছাদিত গহবর অথবা কলাস্থ ফাঁকসমূহে স্বাভাবিক পরিমাণের চেয়ে বেশী পরিমাণ পানি জমাকে এডেমা বা পানিবদ্ধতা বলে। যে ক্ষেত্রে এ পানিবদ্ধতা স্থানীয়ভাবে সীমাবদ্ধ থাকে তখন তাকে স্থানীয় পানিবদ্ধতা বলে। যে ক্ষেত্রে এ সমস্ত দেহে ব্যাপ্তি লাভ করে তখন তাকে সর্বব্যাপী বা জেনারেলাইজড পানিবদ্ধতা বলে। একে এনাসারকও বলে।

জমা পানি কোষের প্রটোপ্লাজমের সাথে গভীরভাবে জড়িত থাকে। যার ফলে পানিবদ্ধতার দুটো উল্লেখযোগ্য নিদানিক লক্ষণ উদ্ভূত হয় ঃ

(১) টিপলে ডেবে যায়,

(২) মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে পানি দেহের নিম্নাংশে জড় হয়।

দেহের কোন্ অংশ আক্রান্ত তার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন অঙ্গের পানিবদ্ধতাকে নিম্নলিখিত নামে অভিহিত করা হয়।

প্লুরিসি—এ ক্ষেত্রে প্লুরাতে পানি জমে।

এসাইটিস—এ ক্ষেত্রে পেরিটোনিয়ামে পানি জমে।

পেরিকারডিয়াল ইফুসন—এ ক্ষেত্রে পেরিকারডিয়ামে পানি জমে।

দেহে চার লিটারের বেশী পানি জমলেই তবে তা নিদানিকভাবে ধরা পড়ে।

পানিবদ্ধতা প্রদাহজনিত কারণে সংঘটিত হতে পারে যখন তাকে একজুডেশন বলে। পক্ষান্তরে অপ্রদাহজনিত কারণে উদ্ভূত পানিবদ্ধতাকে ট্রানজুডেশন বলে।

একজুডেশন ও ট্রানজুডেশনের মধ্যে পার্থক্য

		একজুডেশন	ট্রানজুডেশন
১।	আপেক্ষিক গুরুত্ব	— অধিক-১·০১৫ এর উপর	— কম, ১·০০৬-১·০১২ এর নিচে
২।	প্রোটিনের পরিমাণ	— শতকরা ৪ ভাগের চেয়ে বেশী	— শতকরা তিন ভাগের চেয়ে কম
৩।	জমাট বাঁধা	— ফিবরিন বিদ্যমান থাকায় তাড়াতাড়ি জমাট বাঁধে	— ফিবরিনের পরিমাণ নগণ্য হওয়ায় জমাট বাঁধে না
৪।	প্রকৃতি	— প্রদাহজনিত	— অপ্রদাহজনিত

কারণসমূহ ঃ পানিবদ্ধতার কারণসমূহ হলো —

১। রক্তনালীতে হাইড্রোসটেটিক চাপের মাত্রা বৃদ্ধি,
২। রক্তনালীর দেওয়ালের ভেদ্যতা বৃদ্ধি।
৩। রক্তের কলয়ডজনিত আস্রবন চাপ কমে যাওয়া,
৪। লসিকা প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি,
৫। দেহ হতে সোডিয়াম ও পানি পর্যাপ্ত পরিমাণে নিষ্ক্রমিত হতে না পারা।

(১) **রক্তনালীতে হাইড্রোসটেটিক চাপ বৃদ্ধি**—ধমনীতে রক্তের চাপ কোলায়ডজনিত আস্রবণ চাপের চেয়ে বেশী হওয়ার ফলে পুষ্টিযুক্ত রস কলাতে পৌঁছায়। আরটেরিওলের দিকে রক্তের হাইড্রোসটেটিক চাপ হল ৩৩ মিলিমিটার/পারদ এবং শিরার দিকে তা হলো ১২ মিলিমিটার/পারদ। পক্ষান্তরে কোলয়ডজনিত চাপ হলো ২২—২৫ মিলিমিটার/পারদ। হাইড্রোসটেটিক চাপ যদি অধিক পরিমাণে বেড়ে যায় তবে তরল পদার্থ কলায় স্থানান্তরিত হয় যার ফলে দেহে পানিবদ্ধতা দেখা দেয়।

যে সমস্ত কারণে এ ঘটতে পারে তা হলো ঃ

(১) হৃৎপিণ্ডের বিফলতা—এখানে শিরার চাপ বৃদ্ধি পায়,
(২) শিরার প্রবাহমান রক্তে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে, যেমন, রক্ত জমাট বাঁধা,
(৩) যকৃতের সিরোসিস রোগে পোর্টাল রক্ত প্রবাহে চাপ বৃদ্ধি হয়,
(৪) প্রদাহ।

(২) **রক্তনালীর দেওয়ালের ভেদ্যতা বৃদ্ধি পাওয়া**— রক্তনালীর

দেওয়ালের ভেদ্যতা যদি বৃদ্ধি পায় তবে প্লাজমা ও তার সাথে প্লাজমা প্রোটিন রক্তনালী হতে কলায় স্থানান্তরিত হয়। এর ফলে পানিবদ্ধতা দেখা দেয়।

যে সমস্ত কারণে এ সংঘটিত হয়ঃ—(১) হৃদযন্ত্রের বিফলতা—এখানে শিরার চাপ বৃদ্ধি পায়, (২) শিরায় প্রতিবন্ধকতা—যেমন—সিরোসিসে পোর্টাল হাইপারটেনসনের সৃষ্টি হয়ে রক্ত জমাট বাঁধা ইত্যাদি, (৩) প্রদাহ। প্রোটিনের নিষ্ক্রমণ কলার কলয়ডল আস্রবণ চাপ বৃদ্ধি ও আন্তকোষীয় উক্ত চাপ বৃদ্ধি করে শোথ সৃষ্টিতে আরও সাহায্য করে।

যে সমস্ত কারণে এ অবস্থা দেখা যায় তারা হলোঃ—

(ক) রক্তনালীর এনডোথেলিয়াম-এর আঙ্গিক ক্ষতি সাধন—প্রদাহ, অভিবিস বা রাসায়ন দ্বারা সৃষ্ট।

(খ) শিরার রক্তচাপ বৃদ্ধি—যেমন হৃদপিণ্ডের বিফলতা বা নেফারাইটিস পাওয়া যায়।

(৩) **রক্তের কলয়ডল রক্তচাপ কমে যাওয়া**—স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তের কলয়ডল আস্রবণ চাপের মাত্রা হলো ২২-২৫ মিলিমিটার/পারদ। এই চাপ প্লাজমাকে রক্তনালী হতে কলায় বের করে দেয় যে হাইড্রোসটেটিক তা মোকাবেলা করার জন্য যথেষ্ট। এর ফলে রক্তের প্লাজমা অথবা প্রোটিন বের হতে পারে না।

কিন্তু যে ক্ষেত্রে রক্তের প্লাজমা প্রোটিন দেহ হতে নির্গত হয়ে যায় তখন রক্তের কলয়ডল আস্রবণ চাপ দারুণভাবে কমে যায়। এই অবস্থায় প্লাজমাকে রক্তনালীতে ধরে রাখা আর সম্ভবপর হয় না। ফলে শোথের সৃষ্টি হয়।

যে সমস্ত কারণে প্রোটিন রক্ত হতে নির্গত হয় তা হলো—

(ক) প্রস্রাবের সাথে প্রোটিনের নির্গমন—যেমন নেফরাইটিস, নেফরোটিক সিনড্রোম ইত্যাদি।

(খ) প্রোটিনের সংশ্লেষণে কমতি যেমন সিরোসিস, অপুষ্টি, অনাহার ইত্যাদি।

(৪) **লসিকা প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা**—লসিকা প্রবাহের মাধ্যমে কলার রস অপসারিত হয়। সেজন্য যদি লসিকা প্রবাহ কোন কারণে অবরুদ্ধ হয় তবে দেহ রস অপসারিত হতে ব্যর্থ হয় ও উক্ত স্থানে শোথ দেখা দেয়। এই প্রকার শোথ সাধারণত স্থানীয়ভাবে সীমাবদ্ধ থাকে। কারণসমূহ হলো ঃ—(১) প্রদাহ, (২) টিউমার, (৩) ফাইলেরিয়াসিস, (৪) বাইরের চাপ।

(৫) **দেহরসের আস্রবণ চাপ বৃদ্ধি**—প্লাজমা প্রোটিন দেহের কলায় নীত হলে, উক্ত স্থানের কলা-রসের, আস্রবণ চাপ বৃদ্ধি পায়। সেই অবস্থা মোকাবেলা করে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য রক্তনালী হতে আরও প্লাজমা বেরিয়ে আসে ও শোথ সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

(৬) **কলারসে সোডিয়াম ও ক্লোরাইডএর মাত্রা বৃদ্ধি**—কলারসে সোডিয়াম ও ক্লোরাইডএর পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে তার আস্রবণ চাপ বৃদ্ধি পায়। সে কারণে দেখা যায় নুন খাওয়া কমিয়ে দিলে শোথের উন্নতি সাধিত হয়।

শ্রেণীবিভাগ

শোথ নিম্নপ্রকারের হয়ে থাকে ঃ

(ক) **হৃৎপিণ্ডজনিত শোথ**—কনজেনেটিভ হৃৎপিণ্ড বিফলতায় এই ধরনের শোথ সৃষ্টি হয়।

যে সমস্ত নিয়ামক এর জন্য দায়ী তা হলো ঃ (১) শিরায় রক্ত চাপের বৃদ্ধি; (২) পানি ও লবণের ধারণ।

এ ক্ষেত্রে পানি কলাতে খুব আলগাভাবে বিরাজ করে যার ফলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে দেহের নিম্নাংশে জমা হয়। দেহের অবস্থানের সাথে সাথে তাদের অবস্থানের ধরনের পরিবর্তন ঘটে। বিভিন্ন সেরাস-থলিতে পানি জমে যার ফলে প্লুরিসি, এসাইটিস ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। ফুসফুসেও পানি জমা হয়।

(খ) **কিডনীজাত শোথ**-এ জাতীয় পানিবদ্ধতা সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কারণে সৃষ্টি হয় ঃ

(১) প্রস্রাবের সাথে প্রচুর পরিমাণে এলবুমিন নির্গত হওয়া। এর ফলে রক্তের প্রোটিন কমে যায়। ফলে তার আস্রবণ চাপ হ্রাস পায় ও প্লাজমা কলায় রূপান্তরিত হয়।
(২) প্রস্রাবের মাত্রা কমে যাওয়া,
(৩) কলাতে পানি ও লবণ জমা,
(৪) ক্যাপিলারীসমূহের ভেদ্যতা বৃদ্ধি।

এই শ্রেণীর শোথ ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়। যে সমস্ত অন্তর্বর্তী কলা ঢিলে ও ছাড়া ছাড়া সেখানে বেশী মাত্রায় প্রতীয়মান হয়। এই কারণে মুখমন্ডল বিশেষ করে চোখের চতুরদিকের কলায় বেশী পরিদৃষ্ট হয়। সেরাস থলিসমূহ সাধারণত আক্রান্ত হয় না। শোথের পানিতে প্রোটিনের

পরিমাণ ও এর আপেক্ষিক গুরুত্ব কম।

(গ) **অনাহার জাত শোথ**—যে সমস্ত ক্ষেত্রে জনসাধারণ দারুণ অনাহারের শিকার হয় যেমন—বন্যা, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদিতে শোথ সৃষ্টি হতে পারে। এক্ষেত্রে রক্তের প্রোটিন কমে যাওয়ার ফলে রক্তের আস্রবণ চাপও কমে যায়। ফলে শোথের সৃষ্টি হয়।

(ঘ) **শীর্ণতাজনিত শোথ**—দেহ শীর্ণতা মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে শোথের সৃষ্টি হতে পারে। এর কারণ বিবিধ ঃ হৃৎযন্ত্রের বিফলতা, রক্তনালীর দেওয়ালের ভেদ্যতা বৃদ্ধি, রক্তের প্রোটিন কমে যাওয়া ইত্যাদি।

(ঙ) **প্রদাহজনিত শোথ**—প্রদাহও শোথের এক কারণ হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে প্রদাহের এক লক্ষণই হলো শোথ। একে একজুডেট বলে। এ স্থানীয়ভাবে কেন্দ্রীভূত থাকে ও এ প্রোটিনসমৃদ্ধ। ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট অভিবিষের প্রভাবে রক্তনালী দেওয়ালের ভেদ্যতা বৃদ্ধিই এর কারণ।

(চ) **এলর্জিওনিউরোটিক শোথ**—এলার্জীজনিত কারণেও শোথ উৎপন্ন হতে পারে। হিস্টামিন ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা রক্তনালীর ভেদ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য এ ধরনের শোথ সৃষ্টি হয়।

(ছ) **যকৃতজাত শোথ**—নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে এ ধরনের শোথ পাওয়া যায় ঃ—

(ক) পোর্টাল হাইপারটেনশান,
(খ) হাইপারপ্রোটেনিমিয়া,
(গ) লসিকা প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা,
(ঘ) এলডোসটেরোন যদি ঠিকমত বিপাকিত হতে না পারে।

(জ) **পালমোনারী শোথ**—নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে এদের পাওয়া যায় ঃ
(ক) লেফট ভেন্ট্রিকুলার জাতীয় বিফলতা, (খ) মাইট্রাল স্টেনোসিস
(গ) ফুসফুসের প্রদাহ, (ঘ) মস্তিষ্কজনিত অবস্থা, (ঙ) হাইপোস্ট্যাসিস।

শক (Shock)

যে অবস্থাতে নিম্নলিখিত নিদানিক অবস্থাসমূহের সৃষ্টি হয় তাকে শক বলে ঃ

(১) অজ্ঞান হওয়া, (২) অত্যন্ত দ্রুত ও ক্ষীণ নাড়ী স্পন্দন, (৩) দেহের

তাপের মাত্রা হ্রাস হওয়া, (৪) অস্বাভাবিক ঘাম ও (৫) খুব ঘন অগভীর শ্বাস-প্রশ্বাস।

মূলতঃ রক্ত চলাচল প্রক্রিয়া গন্ডগোলের ফলে শক সৃষ্টি হয়। এখানে প্রয়োজনের অনুপাতে রক্ত সরবরাহ কম হয় ও তার ফলে দেহের কলায় পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টি পেঁছাতে পারে না ও অক্সিজেন স্বল্পতা সৃষ্টি হয়।

শ্রেণীবিভাগ

প্রধানতঃ এরা দু'শ্রেণীর ঃ

১। (অ) প্রাথমিক—এ স্নায়ুজনিত ও মনের আবেগজনিত কারণে উৎপন্ন হয়। প্রান্তিক রক্তনালী স্ফীত হয়ে থাকে ও সেখানে রক্ত প্রচুর পরিমাণে জমা হয়। ফলে মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহে ঘাটতি পড়ে ও এই অবস্থার সৃষ্টি হয়।

ভীতি, দুশ্চিন্তা, ব্যথাই এর কারণ। এই অবস্থা ক্ষণস্থায়ী।

(আ) মাধ্যমিক—প্রান্তিক রক্ত প্রবাহের নালীর আয়তন ও প্রবাহিত রক্তের পরিমাণের মধ্যে বৈষম্য ঘটলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। এর ফলে কলায় হাইপোক্সিয়া বা অক্সিজেন স্বল্পতার সৃষ্টি হয়।

মাধ্যমিক শককে প্রকৃত শক বলে। যে সমস্ত বিভিন্ন কারণে এই অবস্থার উদ্ভব হয় তার উপর ভিত্তি করে এদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

২। রোগ জননতত্ত্বের ভিত্তিতে এদের নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ

(ক) হাইপোভলুমিক শক—হৃৎপিন্ডের কার্যক্ষমতা হ্রাস পেলে কলাতে দারুণ রক্তের অভাব ঘটে। উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ—রক্তপাত, বমি, অগ্নি-দগ্ধতা, ডিহাইড্রেশন বা শুষ্কতা ইত্যাদি।

(খ) হৃৎপিন্ডজাত শক — এক্ষেত্রে প্রধানতঃ হৃৎপিন্ডের মাংসপেশী সংকোচন দুর্বল হওয়ার ফলে হৃৎপিন্ডে যথেষ্ট রক্ত পাম্প করে বের করতে ও তা প্রান্তিক রক্তনালীতে প্রেরণ করতে ব্যর্থ হয়।

প্রধান কারণসমূহ—মায়োকার্ডিয়াল ইনফারকশন প্রান্তিক কলা হতে হৃৎপিন্ডে রক্তের প্রত্যাবর্তন কমে যাওয়া ইত্যাদি।

(গ) প্রান্তিক রক্তনালীর অধিক মাত্রায় স্ফীত হওয়া। আরটেরিওল, ভেনুরল ও ক্যাপিলারীসমূহ দারুণভাবে স্ফীত হয় যার ফলে রক্তনালীর তলের আয়তন বেড়ে যায়। প্রবাহিত রক্ত ও এই তলের আয়তনের মধ্যকার সামাঞ্জস্য নষ্ট হয় এবং রক্তচাপ দারুণভাবে কমে যায়।

ব্যাকটেরিয়া জাত প্রদাহ ও অভিবিষ দ্বারা সংঘটিত কলার পরিবর্তনের

ফলে অভিবিষ অবস্থায় এদের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

৩। কারণের ভিত্তিতে শক-কে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে :-

(ক) আঘাতজনিত,
(খ) রক্তপাতজনিত,
(গ) অগ্নিদগ্ধতাজনিত,
(ঘ) অস্ত্রোপাচারজনিত'
(ঙ) প্রদাহজনিত,
(চ) স্নায়ুজনিত।

৪। রোগ ভবিষ্যের ভিত্তিতে শক নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় :

(ক) অপরিবর্তনীয়—যেক্ষেত্রে শক আর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে ব্যর্থ হয় ও রোগীর মৃত্যু ঘটে।

(খ) পরিবর্তনীয়—শক হতে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

রোগ জননতত্ত্ব

এ বিষয়ে মূল ও কেন্দ্রীয় ব্যাপার হলো কলাতে অক্সিজেনের অভাব। রক্ত প্রবাহ হ্রাস পেলে অক্সিজেন ও অন্যান্য পুষ্টি কলাতে ঠিকমত সঞ্চিত (perfused) হতে ব্যর্থ হয়। যদি এই অবস্থা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় তবে অবায়ুজাতীয় বিপাক প্রক্রিয়া শুরু হয় ও ফলে প্রচুর পরিমাণে ল্যাকটিক এসিড উৎপন্ন হয় এবং তার ফলে এসিডোসিস সৃষ্টি হয়।

কলায় রক্তপ্রবাহ হ্রাস পাওয়ার কারণ বিবিধ। পূর্বোল্লিখিত কারণ সমূহের ফলে রক্তের প্লাজমার ক্ষরণ ঘটে। ফলে রক্তের পরিমাণ কমে যায়। এইটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কারণ।

প্রান্তিক কলায় রক্তের পরিমাণ কমে গেলে হৃৎপিন্ডে রক্তের প্রত্যাবর্তনের পরিমাণ হ্রাস পায়। এর ফলে হৃৎপিন্ড যথেষ্ট পরিমাণ রক্ত পাম্প করে দেহে সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়। ফলে দেহের প্রান্তিক কলায় যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন সিঞ্চিত হতে পারে না। যদি এই অবস্থা বহু সময় পর্যন্ত স্থায়ী হয় তবে এই চক্র অবিরাম চলে। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাথমিক হাইপোভলুমিয়া ছাড়াও রক্তপ্রবাহ হ্রাস পেতে পারে। সাধারণতঃ এ সমস্ত ক্ষেত্রে হৃৎপিন্ডের মাংসপেশী এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে যথেষ্ট শক্তিতে সঙ্কুচিত হতে ও রক্ত পাম্প করতে সমর্থ হয় না। এর উপমা হলো হৃৎপিন্ডের বিফলতা, মায়োকারডিয়াল ইনফারকশন ইত্যাদি।

এক্ষেত্রে শুরুতে রক্তপ্রবাহের স্বল্পতা পূরণ করার প্রয়াসে দেহের বিভিন্ন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। যেমন স্নায়ু ও কলা নিসৃত রসজনিত (humoral) পদার্থ বিভিন্ন পদার্থ সৃষ্টি করে যাদের কাজ হলো,

রক্তচাপ ও কারডিয়াক আউটপুট-কে সমুন্নত রাখা। এরা হলো রেনিন-ভি-ই-এম, ক্যাটেকোলামিন, কেমো-রিসেপটর ইত্যাদি। এদের প্রভাবে ব্যাপকহারে রক্তনালীর সংকোচন ঘটে যদিও চামড়ায় ও পেটের অভ্যন্তরস্থ অঙ্গাদির ক্ষেত্রে এর ব্যাপকতা লক্ষণীয়ভাবে বেশী। হৃৎপিন্ড ও মস্তিষ্কের রক্তনালীর ক্ষেত্রে কম। এর ফলে দুই উদ্দেশ্য সাধিত হয়ঃ

(ক রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় এবং রক্তপ্রবাহ অপ্রয়োজনীয় স্থান হতে অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গে স্থানান্তরিত হয়।

অন্যান্য নিয়ামকসমূহ যারা শিরার রক্ত হৃৎপিন্ডে প্রত্যাবর্তনে সাহায্য করে থাকে তারা এ বিষয়ে সহায়ক হয়। এদের মধ্যে অন্যতম হলো—

(ক) এলডোসটেরোন, এবং

(খ) এনটিডাইইউরেটিক হরমোন।

অনুকূল পরিবেশে, এই সমস্ত Compensatory প্রক্রিয়া কার্যকরী হয় ও রোগীর জীবন রক্ষা পায়। এদের রিভারসিবল শক বলে। পক্ষান্তরে পরিবেশ যদি প্রতিকূল হয় তবে শক দূরীভূত হওয়ার পরিবর্তে ক্রমশঃ আরও গভীর হয় ও রোগীর মৃত্যু ঘটে। এদের অপরিবর্তনীয় শক বা ইরিভারসিবল শক বলে।

ইরিভারসিবল শক বা অপরিবর্তনীয় শকের জন্য দায়ী নিয়ামক

শক কেন অপরিবর্তনীয় হয় তার প্রকৃত কারণ এখনও জানা যায়নি। ল্যাবরেটরীতে বস্তুর ওপর চালানো গবেষণার ফলের ভিত্তিতে কিছু হাইপোথেসিস চালু আছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

(ক) এনোক্সিয়া বা কলায় অক্সিজেনের অভাব—কলায় অক্সিজেন স্বল্পতার জন্য রক্তনালীর এনডোথেলিয়াম আঘাতপ্রাপ্ত হয়। এর ফলে রক্তনালীসমূহ স্ফীত হয় এবং এদের ভেদ্যতা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে প্রচুর পরিমাণ রক্ত প্রান্তিক রক্তনালীসমূহে আনীত হয়। সঞ্চিত রক্তের প্লাজমা প্রচুর পরিমাণে কলায় সিঞ্চিত হয়। ফলে প্রবাহিত রক্তের পরিমাণ আরও কমে যায়। ও রক্ত গাঢ় হয়ে পড়ে।

(খ) হৃৎপিন্ডের মাংসপেশী অক্সিজেন স্বল্পতার জন্য স্তিমিত হয়ে পড়ে।

(গ) মস্তিষ্কে রক্তাল্পতা—মস্তিষ্কে রক্তাল্পতা দেখা দিলে ভেসোমটর সেন্টার স্তিমিত হয়ে পড়ে। ফলে প্রান্তিক কলার রক্তনালীসমূহ স্ফীত হয়। এর ফলে সেখানে রক্ত জমা হয় এবং অত্যাবশ্যকীয় কলাসমূহ যথেষ্ট রক্ত পায় না।

(ঘ) ব্যাপকভাবে রক্তনালী সংকোচন—ব্যাপকভাবে রক্তনালী সংকোচনও অনেকের মতে এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। রক্তনালী সংকুচিত থাকলে উপকারে আসে কিন্তু তা প্রাথমিক অবস্থায়। এ অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হলে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে অক্সিজেন-হীনতা বৃদ্ধি পায় ও কোষসমূহের সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যক্ষমতা বিপর্যস্ত হয়। তখন শক আর দূরীভূত হয় না। এবং অপরিবর্তিত হয়ে থাকে।

(ঙ) ক্যাপিলারীসমূহের স্ফিংটর বা বেষ্টক-পেশী প্রথমে সংকুচিত ও পরে স্ফীত হয়েও এ অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে বলে অনেকে ধারণা করেন।

কলায় অক্সিজেনহীনতার ফলে কিছু বিপাকিত দ্রব্য উৎপন্ন হয় যার ফলে এক চেইন রিয়াকশন বা শিকল চক্র সৃষ্টি হয় যা ক্যাপিলারীসমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ক্যাপিলারীর সামনের বা পেছনের মুখ বেষ্টক-পেশী দ্বারা আবদ্ধ থাকে। অক্সিজেনের অভাব ঘটলে দুই শ্রেণীর বেষ্টনীই সংকুচিত অবস্থায় থাকে যার ফলে রক্তচাপ কমে না। এই সংকোচন মাংসপেশী ও কম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাদিতে ঘটে থাকে। এর উদ্দেশ্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাদিকে রেহাই দেওয়া।

সংকোচনের কারণ হলো ভি-ই-এম (ভেসোএকসাইটর মেটেরিয়াল) যা অক্সিজেন স্বল্পতাসম্পন্ন কিডনী হতে ক্ষরিত হয়। এই অবস্থা বেশী দিন দীর্ঘস্থায়ী হলে ডিকমপেনশেসন প্রক্রিয়া শুরু হয়। ভি-ই-এম ক্ষরণ কম হতে থাকে ও তার বিপরীতধর্মী পদার্থ ভি-ডি-এম (ভেসোডিপ্রেসর মেটেরিয়াল) যকৃত ও রেখায়িত মাংসপেশী হতে ক্ষরিত হতে থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় ভি-ডি-এম যকৃতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু অক্সিজেন স্বল্পতাগ্রস্ত যকৃত তা করতে ব্যর্থ হয়। ভি-ডি-এম এর প্রভাব শুধু ক্যাপিলারীর প্রবেশ পথের বেষ্টনী উপর বিদ্যমান থাকে যার প্রভাবে স্ফীত হয়। পক্ষান্তরে বেষ্টনীর বাহির-পথের বেষ্টনী সংকুচিত থাকে কারণ এর উপর প্রভাব অপেক্ষাকৃত ভাবে কম। ফলে রক্ত ক্যাপিলারীসমূহে প্রবেশ করে কিন্তু বের হতে পারে না ও জমে থাকে।

স্বাভাবিক অবস্থাতে রক্ত কেবলমাত্র অল্প সংখ্যক ক্যাপিলারী নালীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। অধিকাংশ ক্যাপিলারী বন্ধ অবস্থায় বিরাজ করে। একে প্রেফারেন্শিয়াল সারকুলেশন বলে। শক আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে অধিকাংশ বন্ধ ক্যাপিলারী উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। এই অবস্থাকে তুলনা করা চলে মেঝেতে পানি জমলে স্পঞ্জ দিয়ে পানি মোছার সাথে স্পঞ্জের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ফাঁকা জায়গায় পানি জমে যায়। এখানেও মুক্ত ক্যাপিলারীর নালীতে রক্ত

জমে উঠে এবং হৃৎপিন্ডে ফিরে যাবার মত যথেষ্ট রক্ত অবশিষ্ট থাকে না।

(চ) ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা—অনেকে ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকার কথাও বলেছেন। ইদানিং এই মতবাদ গুরুত্ব লাভ করছে, ব্যাকটেরিয়া বিশেষ করে অন্ত্রস্থ ব্যাকটেরিয়া হতে ক্ষরিত অন্তর্বিষ ক্যাটকোলেমিন উৎপন্ন করে রক্তনালী সংকোচন জাত অবস্থাকে আরও শোচনীয় করে তোলে।

(ছ) অন্ত্রজনিত নিয়ামক—অন্ত্রের ঝিল্লীস্তরে রক্তপাতের ফলে প্রচুর রক্তপাত ক্ষত ও কোষ-পচিতি ঘটে। এও অপরিবর্তনীয় শকের কারণ হতে পারে। দীর্ঘকাল রক্তনালী সংকুচিত অবস্থায় থাকার ফলেই ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

(জ) রক্তপ্রবাহে তঞ্চনকারক নিয়ামক—অধিক মাত্রায় রক্ত তঞ্চনের প্রবণতা এবং রক্তধারার স্লথতা থ্রমবাস সৃষ্টিতে সাহায্য করে। থ্রমবাস ক্যাপিলারীসমূহের নালীকে রুদ্ধ করে যার ফলে হৃৎপিন্ডে রক্ত প্রত্যাবর্তনের মাত্রা কমে যায়। ল্যাকটিক অ্যাসিড বেশী মাত্রায় উৎপন্ন হলে হেপারিন নিষ্ক্রিয় হয় এবং কাটেকোলেমিন বেশী মাত্রায় ক্ষরিত হয় এবং রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

গাঠনিক ও জৈব রাসায়নিক পরিবর্তন

গাঠনিক পরিবর্তনসমূহ মূলত রক্ত প্রবাহজনিত পরিবর্তন যেমন—হাইপারমিয়া বা রক্তবদ্ধতা, রক্তাধিক্যতা, থ্রমবাস সৃষ্টি, পেটেচিয়াল জাতীয় রক্তক্ষরণ, বিভিন্ন প্রকার ডিজেনারেশন যেমন ফ্যাটি, এলবুমিনাস ইত্যাদি ও কোষ-পচিতি।

অধিক-হারে আক্রান্ত অঙ্গসমূহ হলো—বৃক্ক, ফুসফুস, হৃৎপিন্ড, যকৃত সুপরারেনাল গ্রন্থি, অন্ত্রের ঝিল্লীস্তর।

বৃক্কের পরিবর্তন সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। আক্রান্ত কিডনীসমূহ আকারে বড় হয়, করটেক্স ফ্যাকাশে হয় এবং পিরামিডসমূহে রক্তাধিক্য ঘটে ও তা দেখতে দানাদার হয়। আণুবীক্ষণিকভাবে টিউবিউলে ডিজেনারেশন ও দানাদার কাস্ট নজরে পড়ে।

ফুসফুসসমূহ কালচে রং ধারণ করে এর রক্তে পরিপূর্ণ হয়। ক্যাপিলারীসমূহে স্ফীত হয় এবং এলভিওলাইতে জলবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। হৃৎপিন্ডে ফ্যাটিচেঞ্জ ও এড্রিনাল গ্রন্থির করটেক্স লিপিডহীনতা উপস্থিত থাকে।

অগ্নিদগ্ধতা (Burn)

অগ্নিদগ্ধতা খুব বিরল ঘটনা নয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বছরে প্রায়

৯০০০ অগ্নিদগ্ধতার ঘটনা ঘটে থাকে। আমাদের দেশেও এ কম নয়।

প্রভাব

অগ্নিদগ্ধতার প্রভাব বিভিন্ন নিয়ামকের উপর নির্ভরশীল।

(১) দেহতলের কতটা আক্রান্ত হয়েছে তার উপর—যত বেশী ক্যাপিলারী নষ্ট হয় তত শক তীব্র হয় ও তত মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হয়।

সমগ্র দেহতলের শতকরা বিশ ভাগ আক্রান্ত হলে রোগীর অবস্থা আশংকাজনক হয়ে পড়ে।

(২) কত গভীরে কোষ-পচিতি ঘটেছে তার উপর—পরে প্রদাহ সৃষ্টি হবে কিনা এবং ক্ষত শুকানোর সময় এপিথেলিয়াম কলা সৃষ্টি হবে কিনা তা নির্ভর করে এই নিয়ামকের উপর। ক্ষত যদি প্রকট হয় তবে তা এপিথেলিয়াম কলা দ্বারা আচ্ছাদিত হতে পারে না।

(৩) দগ্ধতা কত তীব্র তার উপর।

অগ্নিদগ্ধতার শ্রেণীবিভাগ

কত গভীর পর্যন্ত ব্যাপ্তি তার ভিত্তিতে অগ্নিদগ্ধতাকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ঃ

১। **প্রথম ডিগ্রি**—এপিথেলিয়ামের ব্যাসাল স্তর পর্যন্ত বিনষ্ট।

২। **দ্বিতীয় ডিগ্রি**—

(১) মৃদু—যখন এপিথেলিয়াম পর্যাপ্ত পরিমাণে বিনষ্ট হয় না,

(২) তীব্র—প্রচুর এপিথেলিয়াম বিনষ্ট হয় কিন্তু চামড়ার অন্যান্য অঙ্গাদি যেমন ঘাম গ্রন্থি অক্ষত থাকে।

৩। **তৃতীয় ডিগ্রি**—এ ক্ষেত্রে চামড়ার সমগ্র স্তর বিনষ্ট হয়।

বর্তমানে অগ্নিদগ্ধতার শ্রেণীবিভাগ নিম্নলিখিতভাবে করা হয়ঃ

১। আংশিক পুরুত্ব (partial thickness)—উপ-এপিথেলিয়াম বিনষ্ট হয়। চামড়ার অন্যান্য অঙ্গ রক্ষা পায় পুনরায় এপিথেলিয়াম সৃষ্টি এ ক্ষেত্রে সম্ভবপর।

২। পুরা পুরুত্ব—চামড়াস্থ অঙ্গাদি যেমন ঘাম গ্রন্থি চুল বিনষ্ট হয় এপিথেলিয়াম পুনরায় সৃষ্টি হতে পারে না। এখানে চামড়া ট্রান্সপ্লান্টের প্রয়োজন পড়ে।

পরিবর্তনসমূহ

অগ্নিদগ্ধতায় যে সমস্ত পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাদের নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ

(১) স্থানীয়, (২) ব্যাপক।

(১) স্থানীয় পরিবর্তনসমূহ

(ক) কলা তপ্তিত হয়,

(খ) মাইক্রোসার্কুলেশনের পরিবর্তন—হিস্টামিন ও ব্রাডিকিনিন অধিক হারে উৎপন্ন হয় ও রক্ত প্রবাহে পৌঁছায় যার প্রভাবে রক্তনালীসমূহ স্ফীত হয় ও ভেদ্যতা বৃদ্ধি পায়। ফলে প্লাজমা ও তৎসহ প্লাজমা প্রোটিন নির্গত হয়ে অধিক মাত্রায় কলায় প্রবেশ করে। এক্ষেত্রে হাইপোভলুমিক জাতীয় শক সৃষ্টি হয়। শিরার রক্ত কম হারে হৃৎপিন্ডে প্রত্যাবর্তন করার ফলে হৃৎপিন্ড যথেষ্ট রক্ত পাম্প করতে ব্যর্থ হয়। কলাতে রক্ত সরবরাহ হ্রাস পায় ও অক্সিজেনের অভাব ঘটে অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গাদিতে রক্ত সরবরাহ ঠিক রাখার জন্য চামড়া ও অন্যান্য কম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে ক্যাপিলারীসমূহ সংকুচিত হয়। যদি এ অবস্থা তীব্র হয় ও দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গসমূহ আর অক্সিজেনহীনতা সহ্য করতে পারে না। তখন সেখানে কোষ-পচিতি দেখা দেয়।

(গ) প্রদাহ—অধিকাংশ ক্ষেত্রে আক্রান্ত স্থানে প্রদাহ দেখা দেয়, এ ঘটতে চব্বিশ ঘন্টা সময় নেয়। প্রদাহ তীব্র হলে সেপসিস দেখা দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যুও ঘটতে পারে।

যে সমস্ত জীবাণু প্রদাহের জন্য দায়ী তারা হলোঃ

প্রটিয়াস, এ, এরোজেনাস, স্টাফাইলোকক্কাস, স্টেপটোকক্কাস, সিউডোমোনাস ইত্যাদি।

ব্যাপক পরিবর্তন সমূহ

ব্যাপক পরিবর্তনসমূহ হলোঃ

(ক) শক,

(খ) টক্সিমিয়াঃ কারণসমূহ হলো—অভিবিষ শোষিত হওয়া,

(গ) ফুসফুসে পানিবদ্ধতা সৃষ্টির কারণ–(১) রক্তবদ্ধতা, (২) ভেদ্যতা বৃদ্ধি, (৩) এলবুমিন নির্গত হওয়া,

(ঘ) গ্লোমেরিউলাস ও টিউবিউল বিনষ্ট। কারণঃ রক্তপ্রবাহের স্বল্পতা,

(ঙ) ফ্যাটি পরিবর্তন,

(চ) মায়োকার্ডিয়াল ইনফারকশন—স্থানে স্থানে,

(ছ) কায়লিংএর ক্ষত—পাকস্থলীর উপর স্টেরয়েড এর প্রভাবে এ সৃষ্টি হয়।

(জ) এডরিনাল গ্রন্থির আকার বৃদ্ধি হয় এবং এডরিনাল হরমোন অধিকহারে ক্ষরিত হয়।

৬

প্যাথলজীক্যাল ক্যালসিফিকেশন ও পিগমেণ্ট ডিজেনারেশন

প্যাথলজীক্যাল ক্যালসিফিকেশন

স্বাভাবিক অবস্থায় দাঁতে ও হাড়ে ক্যালসিয়াম সংস্থাপিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন রোগে দেহের অন্য কলাতেও ক্যালসিয়াম সংস্থাপিত হয়ে থাকে। সেই অবস্থাকে প্যাথলজীক্যাল ক্যালসিফিকেশন বলে।

শ্রেণীবিভাগ

প্যাথলজীকাল ক্যালসিফিকেশন দুই শ্রেণীর :

(ক) মেটাসট্যাটিক বা স্থানান্তরিত,

(খ) ডিসট্রফিক বা পুষ্টিত্রুটি গত।

(ক) মেটাসট্যাটিক বা স্থানান্তরিত ক্যালসিফিকেশন—

যখন কোন রোগ বা আঘাত ব্যতিরেকে সুস্থ কলাতে ক্যালসিয়াম সংস্থাপিত হয় তখন তাকে মেটাসট্যাটিক ক্যালসিফিকেশন বলে। সাধারণতঃ ক্যালসিয়ামের বিপাক প্রক্রিয়া গন্ডগোলের জন্য এর সৃষ্টি। এ অবস্থায় রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

যে সমস্ত অবস্থায় এদের পাওয়া যায় :

(১) হাইপার প্যারাথাইরডিজম—প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থির এডেনোমা, কলাবিবর্ধন, কারসিনোমা ইত্যাদি।

(২) অসটেরাইটিস ফাইব্রোমা,

(৩) হাড়ের টিউমার, যেমন মাল্টিপল মায়েলোমা, লিউকেমিয়া,

(৪) হাড় বহির্ভূত টিউমার যেমন লিমফোমা, ফুসফুসের ক্যান্সার, মূত্রাশয়, প্যানক্রিয়াস, এসোফেগাস ইত্যাদির টিউমার,

(৫) হাইপার থাইরডিজম,

(৬) শিশুদের অজানা কারণে রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রাবৃদ্ধি,

(৭) সারকয়েডোসিস,

(৮) ডি-ভিটামিনের মাত্রাধিক্য,

(৯) বৃক্কের যক্ষা।

যে সমস্ত কলায় সাধারণতঃ এদের পাওয়া যায়—(১) কিডনীর টিউবিউলের উপঝিল্লী, (২) ফুসফুসের এলভেওলাসের দেওয়ালের আচ্ছাদন কোষ, (৩) পাকস্থলীর উপঝিল্লী।

কম সাধারণ—থাইরয়েড, লিভার, মায়োকারডিয়াম।

খালি চোখে দৃশ্যমান অবয়ব—আক্রান্ত স্থান শুভ্র, সূক্ষ্ম দানাদার হিসাবে প্রতীয়মান হয়। টিপলে পাথুরে বলে অনুভূত হয়।

আণুবীক্ষণিক চিত্র—অণুবীক্ষণের নিচে কালচিটে বেগুনী রংএর স্ফটিক অথবা অকেলাস বস্তু হিসাবে দেখা যায়।

(খ) ডিসট্রফিক বা পুষ্টিক্রটিজনিত

বিভিন্ন কারণে যেমন ডিজেনারেশন, কোষ-পচিতি বা আঘাতের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কলাতে যখন ক্যালসিয়াম সংস্থাপিত হয় তখন তাকে ডিসট্রফিক ক্যালসিফিকেশন বলে। এক্ষেত্রে রক্তের ক্যালসিয়ামের মাত্রা স্বাভাবিক থাকে। যেসমস্ত কলাতেও অবস্থাতে এ অবস্থা পাওয়া যায়—

(১) শিরায় সৃষ্ট থ্রমবাস,
(২) ইনফারকশন হয়েছে এমন কলা,
(৩) ক্যাজিয়েশন জাতীয় কোষ-পচিতি,
(৪) পুঁজাক্তির দেওয়াল,
(৫) পুরান হেমাটোমা
(৬) চর্বি কলায় সৃষ্ট কোষ-পচিতি,
(৭) এথেরোমা,
(৮) কোন কোন টিউমার,
(৯) কলয়েড গয়টার,
(১০) মৃত পরজীবী যেমন—হাইডাটিড সিস্ট ইত্যাদি।

গাঠনিক পরিবর্তন—খালি চোখে দৃশ্যমান এবং আণুবীক্ষণিক পরিবর্তন ঠিক যেমনটি স্থানান্তরিত ক্যালসিফিকেশনের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় তেমনই।

পিগমেণ্ট বা তন্তু রঞ্জকসমমূহের বিপাক প্রক্রিয়ার গণ্ডগোল

কোন কোন তন্তুরঞ্জক দেহের জন্য অত্যাবশ্যক। কিন্তু ওদের পরিমাণ যদি বৃদ্ধি পায় অথবা খুব কমে যায় তখন তা দেহের পক্ষে অনিষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

তন্তু রঞ্জকের বিপাক প্রক্রিয়ার গন্ডগোল নানাবিধ নিয়ামকের দ্বারা প্রভাবিত। এই বিপাকক্রিয়া গোলযোগের ফলে সৃষ্ট লক্ষণাদি নিম্নলিখিত রূপে প্রকাশ পেয়ে থাকে ঃ

(ক) কলাতে অত্যধিক মাত্রায় রঞ্জক জমা হয়ে রঞ্জিত করে। এই অবস্থাকে পিগমেন্টেশন বলে।

(খ) রঞ্জকের মাত্রা হ্রাস পেতে পারে অথবা একেবারে অনুপস্থিত থাকতে পারে। এই অবস্থাকে ডি-পিগমেন্টেশন বলে। রঞ্জক পদার্থ দুই প্রকারের হয় ঃ

(১) অন্তর্জাত (Endogenous)—এই ক্ষেত্রে রঞ্জকসমূহ দেহের কোষ দ্বারা গঠিত হয়।

উদাহরণ ঃ

(অ) মেলানিন

(আ) হেমোগ্লোবিন—হেমোসয়ডেরিন
পিত্ত রঞ্জক বা বাইলিপিগমেন্ট
পরফাইরিন,
লাইপোক্রোম।

(২) বহির্জাত (Exogenous)—এই ক্ষেত্রে রঞ্জক পদার্থসমূহ বাহির হতে দেহে প্রবেশ করে যেমন—টাট্টু-দাগ, সিসা-বিষাক্ততা, রূপা-বিষাক্ততা।

মেলানিন

মেলানিন এক জাতীয় কাল বা হালকা ধূসর রংয়ের রঞ্জক পদার্থ যা নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া যায় ঃ

(১) চামড়া, (২) চোখের আইরিশ, (৩) এড্রেনাল গ্রন্থির মেডালা, (৪) হেয়ার ফলিকিউল, (৫) সাবস্টানসিয়া নিগেরা, (৬) ডিম্বাশয়।

উপত্বকের ব্যাসাল স্তরে অবস্থিত মেলানোব্লাস্ট ও মেলানোসাইট কোষ হতে এদের উৎপত্তি। এই কোষসমূহ শাখা-প্রশাখা সম্পন্ন। পূর্বে এদের উপবিল্লী হতে উৎপন্ন বলে মনে করা হতো, কিন্তু এখন প্রমাণিত হয়েছে যে, এরা নিউরাল ক্রেস্ট হতে উদ্ভূত।

টাইরোসিন নামক এক শ্রেণীর এমিনোএসিড হলো এর অগ্রদূত। টাইরোসোনেজ নামক এক বিজারকের প্রভাবে বিভিন্ন জারন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এরা মেলানিনে রূপান্তরিত হয়।

মেলানোব্লাস্টসমূহ ডোপা-সাপেক্ষ। এরা ডোপা বা ডি-হাইড্রক্সি

ফিনাইল এলানিন মেলানোজিনেজ বিজারকএর সাহায্যে মেলানিনে রূপান্তরিত করতে সমর্থ হয়; টাইরোসিন-টাইরোসিনেজ--ডোপা-মেলানোজিনেস (মেলানো-ব্লাস্ট)—মেলানিন।

উৎপন্ন মেলানিন মেলানোফোর নামক ম্যাকরোফেজ দ্বারা ভক্ষিত হয়ে স্থানান্তরিত হয়। এরা ডোপা-নিরপেক্ষ। কারণ এদের মধ্যে মেলানোজিনেজ উপস্থিত থাকে না এবং এরা মেলানিন প্রস্তুত করতে সমর্থ হয় না। এভাবে ডোপা-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই দুই শ্রেণীর কোষসমূহকে একে অপর হতে বিভক্ত ও সনাক্ত করা সম্ভব।

মেলানিনের প্রধান কাজ হলো সূর্য রশ্মি হতে দেহকে রক্ষা করা।

যে সমস্ত নিয়ামক মেলানিন প্রস্তুতে প্রভাব বিস্তার করে—

(১) মেলানিন স্টিমুলেটিং হরমোনের প্রভাবে পিটুটারী গ্রন্থির কার্য বৃদ্ধি—সাহায্য করে,
(২) এসট্রোজেন হরমোন—সাহায্য করে,
(৩) কপার বা তামা—সাহায্য করে,
(৪) ভিটামিন-সি—বাধা দেয়
(৫) থাইইউরোসিল।

যে সমস্ত রোগে মেলানিম অধিকমাত্রায় প্রস্তুত হয়—

(১) এডিসনের অসুখ,
(২) মেলানোমা,
(৩) মেলানোসিস কোলি—এপেনডিক্সসহ বৃহদন্ত্রের ঝিল্লীস্তরে প্রচুর মেলানিন রঞ্জন জমা হয়। এরা ডোপা-নিরপেক্ষ। ভক্ষিত খাদ্য হল এদের উৎস।
(৪) অক্রোনোসিস—এ এক জাতীয় রোগ যেখানে মেলানিন সাদৃশ রঞ্জক পদার্থ কারটিলেজ, মাংসপেশী, উপঝিল্লী কোষ, সংযোজক কলাতে সংস্থাপিত হয়।
এই অবস্থা খুব বিরল এবং বিজারকের খুঁতের ফলেই এর সৃষ্টি।
(৫) **কোলোসমা**—এ এক ধরনের রোগ, যেখানে চামড়ায় অত্যধিক মেলানিন রঞ্জক সংস্থাপিত হয়। বিশেষ করে গর্ভাবস্থায় ও মেয়েদের জননযন্ত্রে বিভিন্ন রোগে ও গ্রেভএর অসুখে এদের পাওয়া যায়।
(৬) মালটিপল নিউরো-ফাইব্রোমাটোসিস,
(৭) অধিক মাত্রায় সূর্য রশ্মিতে ঘোরাফেরা করা,
(৮) প্রায়ই এক্স-রে দেওয়া,

(৯) গর্ভাবস্থা,
(১০) একরোমেগালা।
(১১) আরসেনিক বিষাক্ততা,
(১২) হেমোক্রোমাটোসিস,
(১৩) রিউমেটয়েড আরথাইটিস,
(১৪) শীর্ণতা,
(১৫) এলররাইট সিনড্রোম,
(১৬) ফ্যামিলিয়াল গ্যাসট্রো ইনটেসটাইনাল পালপোসিস।

যে সমস্ত রোগে মেলানিন রঞ্জকের পরিমাণ কমে যায়—
(১) এলবিনোস—জন্মগতভাবে সম্পূর্ণ রংহীন।
(২) শ্বেত বা লিউকোডারমা,
(৩) ভিটিলেগো (vitiligo)
(৪) তন্তুপ্রাচুর্যময় এলাকা (scarred areas)
(৫) কুষ্ঠরোগ (leprosy)

রক্তজাত কলারঞ্জক পরফাইরিন

পরফাইরিন হেমোগ্লোবিনের অলৌহজ এমন এক উপাদান যা রক্তের সাথে কড়া সালফিউরিক এসিড মেশালে উৎপন্ন হয়। একে আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির সাথে মেশালে এক প্রকার লাল ঝলঝলে রং বের হয়।

পরফাইরিন হেমোগ্লোবিনের এক মৌলিক উপাদান যা লৌহজাত উপাদানের সাথে মিশে থাকে। পরফো-বিলিনোজেন তিন শ্রেণীর পরফাইরিনের অগ্রদূত, যাদের নাম হলো—
(১) ইউরোপরফাইরিন,
(২) কপরোপরফাইরিন ও
(৩) প্রটোপরফাইরিন।

কপরোপরফাইরিন যকৃত কর্তৃক নিঃসৃত হয়ে পিত্তের মাধ্যমে মলে পৌছায়। ইউরোপরফাইরিন বৃক্কের মধ্য দিয়ে দেহ হতে বের হয়। একে স্বাভাবিক-ভাবে প্রস্রাবে সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়।

পরফাইরিয়া

পরফাইরিয়া বলতে এমন কতকগুলো রোগের সমষ্টি বোঝায় যা পরফাইরিনের বিপাক প্রক্রিয়ার গন্ডগোলের জন্য সৃষ্টি হয়। এদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ঃ

(১) বংশগত, (২) তাৎক্ষণিক, (৩) দীর্ঘস্থায়ী।

(১) **বংশগত**—এ বংশগত রোগ বা জিনের মাধ্যমে বংশগত পরম্পরা বিস্তার লাভ করে। পরফোবিলিনোজেন সুচারুরূপে পরফাইরিনে রূপান্তরিত হতে পারে না। এর ফলে স্বাভাবিক শ্রেণী-৩ এর পরিবর্তে বেশী মাত্রায় পরফাইরিন শ্রেণী-১ এর সৃষ্টি হয়। এ অধিক মাত্রায় নিষ্ক্রমিত হয় ও কলায় সংস্থাপিত হয়। ফলে আক্রান্ত কলা রশ্মির প্রতি অতি মাত্রায় সংবেদনশীল হয়ে পড়ে এবং নিম্নলিখিত অবস্থার সৃষ্টি হয়ঃ

(ক) চামড়ায় জলস্ফোটকের সৃষ্টি হয়।

(খ) লোহিত কণিকা বিনষ্টি হওয়ায় হেমোলাইটিক শ্রেণীভুক্ত রক্তশূন্যতা সৃষ্টি হয়।

(গ) প্রস্রাব রঞ্জিন হয়।

(ঘ) দাঁতের রং গোলাপী হয়।

এই রোগ খুব ধীরে ধীরে বাড়ে। মৃত্যুর কারণ হয় লোহিত কণিকার বিনষ্টি অথবা প্রদাহ। শিশুরাই এর শিকার হয় বেশী।

(২) **তাৎক্ষণিক পরফাইরিয়া**—জিনেরডোমিনেন্ট ক্যারাকটার হিসাবে এ আত্মপ্রকাশ করে। প্রাপ্ত বয়স্করা সাধারণতঃ এই রোগে ভোগেন।

দারুণ পেট ব্যথা, ভেলিরিয়াম, খিঁচুনি, হাত পায়ে ব্যথা, অধিক স্পর্শকাতরতা ইত্যাদি স্নায়বিক উপসর্গ এর প্রধান লক্ষণ। ফটো সেনসিটিভিটি বা আলোর প্রতি অত্যধিক সংবেদনশীলতা অনুপস্থিত থাকে। পরফোবিলিনোজেন উপস্থিত থাকার জন্য প্রস্রাব রংহীন হয়। কিন্তু বেশীক্ষণ থাকার পর এ পরফাইরিনে রূপান্তরিত হওয়ায় পোর্টওয়াইনের রং ধারণ করে।

পরফোবিলিনোজেন প্রচুর পরিমাণে যকৃতে ও সামান্য পরিমাণে রক্তে ও বৃক্কে উপস্থিত থাকে।

(৩) দীর্ঘস্থায়ী পরফাইরিয়া—এক্ষেত্রে চামড়াতে ঠিক বংশগত পরফাইরিয়ার মত পরিবর্তন হয়। এ ছাড়াও যকৃতের সিরোসিস ও রশ্মি সংবেদনশীলতা বা ফটোসেন্সিটিভিটি বিদ্যমান থাকে। যকৃতে পরফাইরিন বেশী পরিমাণে উপস্থিত থাকে। পক্ষান্তরে হাড়ে এর পরিমাণ স্বাভাবিক। পেটের ও স্নায়ুজনিত উপসর্গ দেখা যায় না।

হেমোসাইডেরিন

হেমোসাইডেরিন এক জাতীয় লৌহজ উপাদান যার রাসায়নিক কাঠামো এখনও অজ্ঞাত। লৌহমুক্ত অবস্থায় বিরাজ করে এবং 'প্রুশিয়ান ব্লু' প্রতিক্রিয়া দেয়। সূক্ষ্ম গোলাপী হলুদ রংএর স্ফটিকাকারে এদের পাওয়া যায়।

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এদের পাওয়া যায়—নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে হেমোসাইডেরিন পাওয়া যায় ঃ

(১) রক্তপাতযুক্ত কলা—রক্তপাতের ফলে সংস্থাপিত হেমোগ্লোবিনের উৎস হতে এদের কলায় পাওয়া যায়। যেমন হেমোটোমা, হেমানজিওমা, হাড়ভাঙ্গা ইত্যাদি অবস্থায় এদের পাওয়া যায়।

(২) অধিকহারে রক্ত বিনষ্টি ঘটলে—রক্ত বিনষ্টি অধিক হারে দেখা দিলে যেমন পারনিসাস ও হেমোলাইটিক শ্রেণীভুক্ত রক্তশূন্যতায় এদের পাওয়া যায়।

(৩) ঘন ঘন রক্ত পরিসঞ্চালনে।

(৪) ভেনাস কনজেশনে যেমন হৃৎপিণ্ডের বিফলতায় ফুসফুসের আল-ভেওলাসের ম্যাকরোফেজ এই সমস্ত কলায় রঞ্জক পদার্থ ভক্ষণ করে ফলে ফেঁপে উঠে। এদের হার্টফেলিওর কোষ বলা হয়।

(৫) গুড পাসটরের অসুখ,

(৬) অজ্ঞাত কারণে সৃষ্ট জানা হেমোক্রোমাটোসিস রোগে এদের পাওয়া যায়।

এই রোগে চামড়ার রং ধরে, প্যানক্রিয়াসে তন্তু-প্রাচুর্য ঘটে যার ফলে বহুমূত্র রোগ হয় এবং যকৃতে সিরোসিস দেখা দেয়। রক্তে লোহার পরিমাণ বাড়ে ও গিরায় গিরায় প্রদাহ দেখা যায়।

অন্ত্রে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী পরিমাণে লোহা শোষিত হয় ও কলায় সংস্থাপিত হয়। অনেকে মনে করেন এ বংশগত রোগ যা জিনের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে। অনেকে আবার মনে করেন এর কারণ লোহার বিপাক প্রক্রিয়ার গন্ডগোল।

৭
জেনেটিক-এর গণ্ডগোল

ম্যানডেলের আবিষ্কারের পর হতে জেনেটিক-বিদ্যায় বহু উন্নতি হয়েছে। আজ চিকিৎসা শাস্ত্রে এ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। বহু রোগেই জেনেটিক-নিয়ামকের ভূমিকা বিদ্যমান। বেশ কিছু রোগের ক্ষেত্রে সরাসরি এ-ই দায়ী এবং অন্যান্য বহু রোগে এর কোন-না-কোন ভূমিকা থাকে।

এই স্বল্প আকারের বইয়ে এই দ্রুত উন্নতশীল বিষয়ে পুরাপুরি আলোচনা সম্ভব নয়। প্রাথমিক বিষয় ও সংজ্ঞাসমূহ এবং বিভিন্ন জেনেটিক রোগের নাম দেওয়া হলো।

সংজ্ঞা

ক্রোমোজোম—প্রত্যেক জীবন্ত কোষের কেন্দ্রকে লম্বা সুতার মত বস্তু থাকে তাদের ক্রোমোজোম বলে।

এরা ডি-এন-এ দ্বারা গঠিত। কোন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ এই ক্রোমোজোমের উপর নির্ভরশীল। উক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ বংশ পরম্পরায় স্থানান্তরিত হয় এই ক্রোমোজোমের মাধ্যমে। প্রত্যেক প্রজাতির ক্রোমোজোমের সংখ্যা ও আকৃতি সবসময় এক রকম থাকে। মানুষের ক্রোমোজোমের সংখ্যা হলো ২৩ জোড়া বা ৪৬। এর মধ্যে একজোড়া লিঙ্গ নির্ধারণকারী জিন। এদের সেক্স ক্রোমোজোম বলে। বাকী জিনগুলোর নাম হলো এটোসোমাল ক্রোমোজোম। ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য (trail) নির্ধারিত হয় ক্রোমোজোমের মধ্যে অবস্থিত একজোড়া বস্তু দ্বারা যাদের জিন বলা হয়। এরা ক্রোমোজোমের যে স্থানে অবস্থিত তাদের লোকাস বলে। একজোড়া জিনের সমষ্টিকে 'এলেল' বা 'এলেন মরফ' বলে। যেক্ষেত্রে জোড়ার দুটো জিনই এক প্রকার সেক্ষেত্রে এদের 'হোমোজাইগাস' বলে। পক্ষান্তরে যদি তারা ভিন্ন প্রকৃতির হয় তবে তাদের 'হেটেরেজাইগাস বলে।

জিনের অবস্থানের ধরনকে 'জেনোটাইপ' বলে। জিনের বৈশিষ্ট্য যখন প্রকাশ পায় তখন তাকে 'ফেনোটাইপ' বলে। জিন বিদ্যমান থাকলেই চাই সে সমগোত্রীয় জিনের সাথে থাকুক অথবা অসমগোত্রীয় জিনের সাথে থাকুক যখন বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়ে থাকে তখন সেই জিনকে 'ডোমিন্যান্ট জিন'

বলে। পক্ষান্তরে জিন জোড়া যখন শুধুমাত্র সমগোত্রীয় হলেই বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশিত করে অন্যথায় নয়, তখন তাদের 'রিসেসিভ জিন' বলে।

ডোমিন্যান্ট জিনের ক্ষেত্রে কোন কোন সময় বংশ পরম্পরায় এক স্তরে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে ব্যর্থ হয়। এই অবস্থাকে 'রিডিউসড পেনেট্রেশন' বলে। দেখা গেছে কোন কোন ক্ষেত্রে একই পরিবারের সদস্যের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ভিন্ন মাত্রায় প্রকাশিত হয়। এ অবস্থাকে 'ভেরিয়েবল এক্সপ্রেশন' বলে। কোন কোন বৈশিষ্ট্য একাধিক জিন দ্বারা প্রভাবান্বিত ও বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত হয়। এদের 'মালটি ফ্যাকটরিয়াল ইনহেরিটেন্স' বলে।

জেনেটিক অসুখ

জিনের বৈকল্যের জন্য যে সমস্ত রোগ সৃষ্টি হয় তাদের নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—

(১) মেন্ডেলিয়ান,
(২) সাইটোজেনেটিক,
(৩) পলিজেনিক।

(১) **মেন্ডেলিয়ান**—একটি জিনের বৈকল্যের জন্য রোগ সংঘটিত হতে পারে। জিনের মিউটিশন বা পরিব্যক্তির জন্য এ রোগের সৃষ্টি হতে পারে। এরা তিন প্রকারের—

(১) অটোসোমাল ডোমিন্যান্ট,
(২) সেক্স লিনকড,
(৩) অটোসোমাল রেসেটিভ।

অটোসোমাল ডোমিন্যান্টএর বৈশিষ্ট্য হলো

(১) ক্রমান্বয়ে বংশের পর বংশে ছড়াতে থাকে,
(২) অসুখের তীব্রতা কম,
(৩) আক্রান্ত সদস্যরা হেটেরোজাইগাস বা অসমভ্রূণী,
(৪) বংশের শতকরা পঞ্চাশভাগ সদস্য আক্রান্ত হয়,
(৫) ছেলে ও মেয়ে সমহারে আক্রান্ত হয়।

যে সমস্ত রোগ এভাবে সম্প্রসারিত হয়—
ডিসফিজিক্যাল একলিয়াশিয়া,
একনড্রোপ্লাসিয়া,
পলিপসিস কোলি,
হেমোরহেজিক টেলেনজিয়েকটাসিস,
হেমোগ্লোবিনোপাথী,

হেরোডিটারী স্ক্লোরোসাইটোসিস,
গিলবার্ট সিনড্রম,
মারফান সিনড্রম,
হাইপারলিপিড প্রটিনেমিয়া,
পরফাইরিয়া,
চোখের ছানি।

অটোসামাল রিসেসিভের বৈশিষ্ট্য হলো

(১) বংশ পরম্পরায় প্রতিধাপে পাওয়া যাওয়া না,
(২) পিতামাতার এই অসুখ থাকে না,
(৩) ছেলেমেয়েদের রোগাক্রান্ত হওয়ার আনুপাতিক হার ১ : ৪,
(৪) শতকরা ৫০ ভাগ ছেলেমেয়ে এই রোগ বহন করে,
(৫) শিশু অবস্থাতেই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

যে সমস্ত রোগ এভাবে বিস্তার লাভ করে—

(১) সিসটিক ফাইব্রোসিস,
(২) ফিনাইল কেটোনিউরিয়া,
(৩) উলসনের অসুখ,
(৪) গাউচারের অসুখ,
(৫) রেটিনাইটিস পিগমেন্টোসা,
(৬) রিগলাব নাজার সিনড্রম,
(৭) লিম্ব গ্রিড্‌ল মাসকুলার ডিসট্রফি,
(৮) এলবিনিজম,
(৯) গ্যালাকটেসেমিয়া,
(১০) গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিজিজ,
(১১) লিপিড স্টোরেজ ডিজিজ,
(১২) ডাবলিন-জনসন সিনড্রোম,
(১৩) নিমেন-পিক ডিজিজ,
(১৪) শিশুদের প্রগ্রেসিভ মাসকুলার এট্রফি।

সেক্সলিঙ্কড রোগসমূহ

ক্রোমোজোম এক্স ও ওয়াইএর বৈকল্যের জন্যও কোন কোন রোগ সৃষ্টি হয়। এদের সেক্সলিন্কড রোগ বলে। মেয়েরা এইসব রোগের বহনকারী হয় ও পুরুষরা ভুক্তভোগী হয়ে থাকে। আক্রান্ত পুত্র তার বংশধরের মধ্যে রোগ ছড়ায় না। পক্ষান্তরে কন্যা নিজে আক্রান্ত হয় না বটে কিন্তু রোগ বহন করে। ক্রোমোজোম-ওয়াইএর খুঁতের জন্য বিশেষ কোন রোগ

হয় না। একটিমাত্র রোগ দেখা যায় তা হলো কানে প্রচুর চুল হওয়া। কিন্তু ক্রোমোজোম-এক্সএর জন্য বেশ কিছু রোগ হয়ে থাকে। এক্স-ক্রোমোজোমের ডোমিন্যান্ট অসুখও খুব কম। ডি-ভিটামিন প্রতিরোধ্য রিকেট এর একটা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

এক্স-ক্রোমোজোম রিসেসিভ অসুখসমূহ হলো ঃ-

১। গ্লুকোজ ৬-ফসফাটেজ ফসফেট-ডি-হাইড্রোজেনেজ ডেফিসিয়েন্সি,
২। হেমোফিলিক-এ,
৩। হেমোফিলিয়া বি,
৪। এ গামা গ্লোবিনিমিয়া,
৫। হানটার-সিনড্রোম
৬। লিচ নিহান সিনড্রোম,
৭। নেফরোজোনিক ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস,
৮। ডানচেন মাসকুলার ডিসট্রফি।

(খ) সাইটোজেনিক বা কোষ ভ্রূণজাত বৈকল্য

কোন কোন রোগ ক্রোমোজোমের সাংগঠনিক বৈকল্যের জন্য সংঘটিত হতে পারে। এই ধরনের খুঁত ক্রোমোজোমের সংখ্যায় অথবা কাঠামোতে হতে পারে। ক্রোমোজোমে কোন লোকাস অনুপস্থিত থাকতে পারে, স্থানান্তরিত হতে পারে অথবা নির্দিষ্ট স্থানে না হয়ে অন্যত্র বিরাজ করতে পারে। অটোসোমাল ও সেক্স ক্রোমোজোম উভয়ই আক্রান্ত হতে পারে।

অটোসোম-জিনের অস্বাভাবিকত্বের জন্য সৃষ্ট রোগসমূহ—

(১) ডাউন সিনড্রোম,
(২) এডওয়ার্ড সিনড্রোম,
(৩) পাটাউ সিনড্রোম,
(৪) ক্যাটক্রাই সিনড্রোম,

সেক্স-লিঙ্কড ক্রোমোজোমের রোগসমূহ হলো ঃ

(১) ক্লিনফেলটার সিনড্রোম,
(২) টার্নার সিনড্রোম,
(৩) ট্রিপল ফিমেল,
(৪) ডবল মেল।

(গ) পলিজেনিক ইনহেরিটেন্স

এমন বহু রোগ আছে যারা বিবিধ জিন দ্বারা সৃষ্ট কিন্তু তাদের প্রকাশ নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক বিবিধ নিয়ামকের উপর। এমন কি সমভ্রূণী যমজের মধ্যেও একজন উক্ত রোগে ভোগে না অথচ অন্যজনে আক্রান্ত হয়।

কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আক্রান্তজনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা রোগ সৃষ্টির অনুকূলে ছিল। সুস্থ জনের ক্ষেত্রে তা ছিল।

পলিজেনিক ইনহেরিটেন্সের আওতাভুক্ত রোগ হলো—

১। বহুমূত্র,
২। উচ্চ রক্তচাপ,
৩। গাউট,
৪। সিজোফ্রেনিয়া,
৫। ম্যানিয়াক ডিপ্রেশন,
৬। কোন কোন জন্মগত হার্টের অসুখ।

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার, ঢাকা বাংলাদেশ Bansdoc Library, Dhaka